কৃষিশিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

কৃষিশিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর ড. মোঃ সদরুল আমিন
প্রফেসর মুহম্মদ আশরাফউজ্জামান
প্রফেসর মোহাম্মদ হোসেন ভূঞা
প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ারুল হক বেগ
ড. কাজী আহসান হাবীব
আনোয়ারা খানম
খোন্দ. জুলফিকার হোসেন
এ কে এম মিজানুর রহমান

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : মে ২০১৫
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ মূলত কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর দেশ। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার, অধিক ফসল ফলনের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং কৃষি বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কৌশলের সাথে পরিচিত করার প্রয়াস নিয়ে **কৃষিশিক্ষা** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদেরকে কৃষির তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক উভয় দিকেই দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	কৃষি এবং আমাদের সংস্কৃতি	১–১৫
দ্বিতীয়	কৃষি প্রযুক্তি	১৬–৩৬
তৃতীয়	কৃষি উপকরণ	৩৭–৫৫
চতুর্থ	কৃষি ও জলবায়ু	৫৬–৭৩
পঞ্চম	কৃষিজ উৎপাদন	৭৪–১০৪
ষষ্ঠ	বনায়ন	১০৫–১২৪

প্রথম অধ্যায়
কৃষি এবং আমাদের সংস্কৃতি

কৃষির সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক রয়েছে। মানব সমাজের ইতিহাস এগিয়েছে মানুষের কৃষিকাজ শুরু করার মাধ্যমে। মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, আবাসন ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য কৃষিকে প্রধান উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। জীবনকে নিরাপদ ও আনন্দঘন করার জন্য মানুষের হাজার বছরের ক্রমাগত প্রচেষ্টা চলেছে। এর মধ্য দিয়েই নানা পরিবেশে নানা আঞ্চলিক ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। উৎপাদন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের এই অর্জনগুলোই ক্রমে ঐ মানবগোষ্ঠীর সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য হয়েছে। কৃষি ও সংস্কৃতির এই আন্তঃসম্পর্কই এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

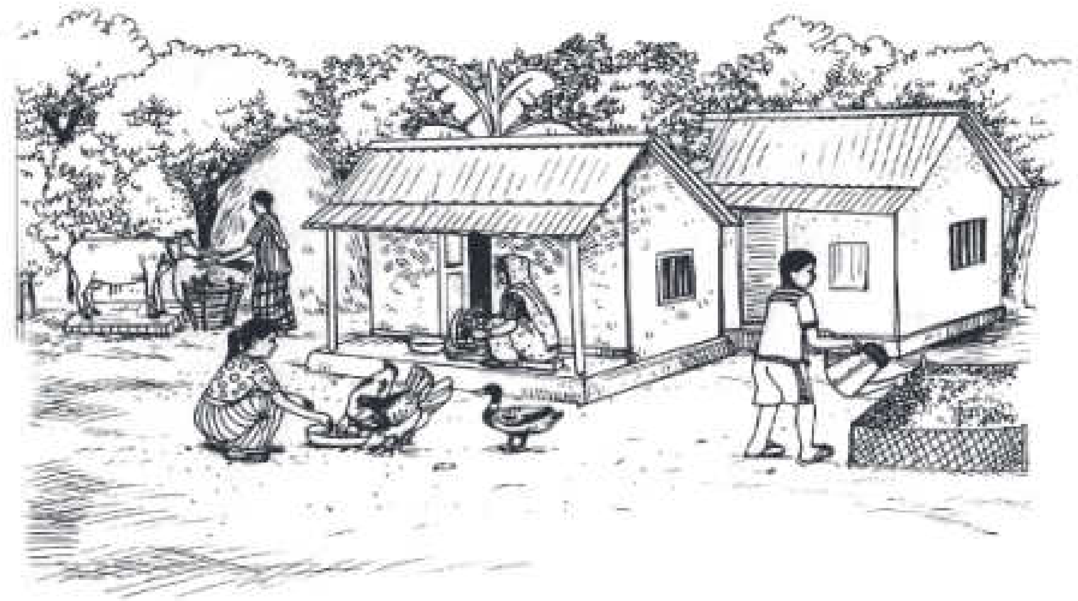

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- পরিবার ও সমাজ গঠনে কৃষির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি এবং কৃষকের উপর মানুষের নির্ভরশীলতার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব ;
- কৃষি পরিবেশ ও ঋতু পরিবর্তনের সাথে কৃষি উৎপাদনের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব ;
- কৃষির বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎপাদন বর্ণনা করতে পারব ;
- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে কৃষি মৌসুমের সম্পর্ক তৈরি করতে পারব ।

পাঠ ১ : পরিবার গঠনে কৃষি

চিত্র–১.১ : মা বাবা ও দুটি সন্তানের সুখী পরিবার

কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে আমাদের পরিবার ও সমাজ গঠনের সূচনা হয়েছিল। কৃষিকাজ করার আগে মানুষ পশু–পাখি শিকার করে অথবা গাছের ফলমূল আহরণ করে খাদ্য সংগ্রহ করত। বনের হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সে সময় মানুষ দলবদ্ধভাবে চলাচল করত। বনের পশু–পাখি শিকারের কাজেও মানুষ দলবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করত। পরিবার সম্পর্কে মানুষের তখনও কোনো ধারণা ছিল না। মানুষ ফলমূল আহরণ ও শিকার করার মাধ্যমে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছিল। পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা ও এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ হতো গুহায় বসবাসকারী মায়েদের। কারণ তাঁদের বাইরে বের হওয়ার তেমন প্রয়োজন হতো না। তাঁরা দেখলেন ফল খেয়ে বীজ যেখানে ফেলে দিচ্ছেন সেখানেই ঐ ফলগাছ জন্মাচ্ছে। বুদ্ধিমতি নারী সবচাইতে সুস্বাদু ফলটির বীজ রাখলেন। যত্ন করে মাটি নরম করে বীজ পুঁতে দিলেন। চারা গজালে তাকে যত্ন করে বড় করলেন এবং এক সময় ফল পেলেন। এভাবেই নারীরা প্রথম কৃষির সূচনা করেছিলেন। শিকারের যুগেই মানুষ আগুনের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ শিখেছিল। পশুর মাংসের মতোই গাছপালা থেকেও সিদ্ধ করে বা পুড়িয়ে সুস্বাদু খাবার তৈরির কৌশলও আয়ত্ত করতে দেরি হলো না নারীদের। অধিকাংশ ফল পাকার পর বেশিদিন রাখা যেত না, পচন ধরত। তাই কোন ফসল বেশিদিন সংগ্রহে রাখা যায় এর খোঁজ চলল। ক্রমে শস্য অর্থাৎ ধান, গম, ডাল ইত্যাদির গুরুত্ব বাড়ল। কারণ এগুলো সংগ্রহের পর দীর্ঘদিন রাখা যায়। এর ফলে খাদ্যের সংকট অনেকটাই লাঘব হলো। এই উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্র হয়ে পড়লেন নারী। কৃষাণি নারী একজন পছন্দমতো পুরুষ সঙ্গী খুঁজে নিয়ে সংসার শুরু করলেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে মিলে গড়ে উঠল তাঁদের পরিবার। ক্রমশ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিয়ে এবং পরিবার সম্পর্কে কিছু নিয়ম–কানুন–প্রথা তৈরি হলো যা পরিবারগুলো মোটামুটি মেনে চলত। এসব নিয়মকানুন কম বেশি এখনও মেনে চলা হয়। পরিবার সমাজের ক্ষুদ্র একক– এ ধারণা এ সময় থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পরিবারসমূহ মানব সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

সংগঠন হিসেবে পরিচিত। শুধু খাদ্য নয়, সার্বিক নিরাপত্তার প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র হলো পরিবার। স্নেহ, ভালোবাসা, নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ দিয়ে সুরক্ষিত সকল পরিবার। বয়স ও সক্ষমতা অনুযায়ী পরিবারের সদস্যরা কাজ ভাগ করে নিতেন।

কাজ: দলে আলোচনা করে নিচের প্রশ্ন দুটির উত্তর তৈরি কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।
১। গুহায় বসবাসকারী নারীরা কীভাবে কৃষিকাজের সূচনা করেছিলেন?
২। পরিবার গঠনে কৃষাণি নারী কীভাবে ভূমিকা রেখেছিলেন?

পাঠ ২ : সমাজ গঠনে কৃষি

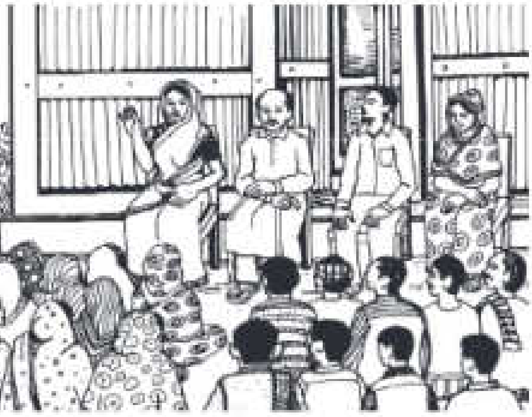

চিত্র-১.২ : সামাজিক বৈঠক

তোমরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃষক মাঠের কাজ করে ফসল ফলান। মাঠ থেকে ফসল সংগ্রহ করে বাড়ি আনেন। কৃষাণি বাড়িতে আনা ফসল যত্ন করে সংরক্ষণ করেন। গ্রামের মহিলারা বাড়ি বাড়ি হাঁস–মুরগি পালন করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষেরা গবাদিপশুর খামার, হাঁস–মুরগির খামার করে কৃষি উৎপাদন করে থাকেন। মাটির জিনিসপত্র তৈরি করেন কুমার। লোহার জিনিসপত্র যেমন– দা, কাঁচি, কুড়াল ইত্যাদি তৈরি করেন কামার।

আদিযুগে পরিবারের সদস্যরা সক্ষমতা ও সুবিধা অনুযায়ী পরিবারের কাজগুলো করতেন। এভাবেই মানুষের মাঝে শ্রম বিভাজনের সুবিধা তৈরি হয়েছিল। সমাজ গঠনে এই শ্রম বিভাজন ভূমিকা রেখেছিল। দিনে দিনে পরিবারের আকার ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। মানুষ ফসলের পরিচর্যা করে ফলন বৃদ্ধি করতে শিখল। ফসল বেশিদিন সংরক্ষণ করে রাখার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করল। ফলে কৃষির পরিধি ও পরিসর বৃদ্ধি পেতে থাকল। কৃষি বিষয়ক এসব পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য মানুষ তাদের বসবাসসহ বিভিন্ন অভ্যাসের পরিবর্তন করেছিল।

মানুষ আর গুহায় না থেকে পরিবেশ থেকে মাটি, বাঁশ, কাঠ, পাতা ব্যবহার করে ঘর-বাড়ি তৈরি করতে শুরু করল। এভাবে বেশকিছু পরিবারের বসতবাড়ি মিলে গ্রামের পত্তন হয়। কৃষির কারণেই মানুষ বেশি বেশি পরিবেশ সচেতন হতে থাকল। ঋতুচক্রের উপর ফসল উৎপাদন যে নির্ভরশীল এটা শিখল। কোন ঋতুতে কোন ফসল উৎপাদন করা যায় তা বুঝল। ফলে উৎপাদন দ্রুতই বাড়তে লাগল। কৃষিকাজ এবং পরিবারের নানা আনুষঙ্গিক জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করে তা উৎপাদনে কিছু লোক অন্যদের চাইতে দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় শ্রম বিভাজন হলো। কুমার মাটির হাঁড়ি-পাতিল, কামার ধাতবযন্ত্র তৈরি করতে লাগল। এভাবেই সবাইকে নিয়ে সমাজ গঠিত হলো। এই ধরনের সমাজকেই নৃবিজ্ঞানীগণ আদি কৃষি

সমাজ বলেছেন। সমাজের সবাই যার যার সাধ্যমতো উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতেন এবং চাহিদামতো ভোগ করতেন। উৎপাদন ক্ষেত্র এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সবার সমান অধিকার ছিল। সবাই মিলে গ্রামগুলোর নিরাপত্তা বিধান করতেন। গ্রামীণ এই আদি সমাজে সমস্যাও ছিল প্রচুর। এ সমাজের মানুষেরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে ফসল বিনষ্ট হওয়া এমন নানা সমস্যা সবাই মিলে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাধান করতেন। এমনকি গুরুতর পারিবারিক সমস্যাগুলোও সামাজিকভাবে সমাধান করতেন। জীবনকে ক্রমাগত সহজ ও সুন্দর করাই ছিল সবার সমবেত আকাঙ্ক্ষা। আদি সমাজে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাজপ্রধান নির্বাচিত হতেন। তিনি ঐতিহ্য ও প্রথা অনুযায়ী সমাজের কাজের সমন্বয় সাধন করতেন।

আমরা দেখেছি মানুষ তার বুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে কৃষিকে একটি প্রধান উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলেছে। কৃষিকে উন্নত থেকে উন্নততর করছে। কৃষির পরিধি ও পরিসর ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলছে। তাই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে নানা মানবিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে চাহিদা তৈরি করে চলেছে। এ কারণে বলা যায় যে মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতেও কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আমার চেয়ে আমার পরিবার বড়, পরিবারের চেয়ে সমাজ বড় এ মূল্যবোধও আদি সমাজের নিকট থেকে এসেছে। এ মূল্যবোধ না থাকলে কৃষি সমাজ অগ্রসর হতে পারত না।

মানব সমাজ বিবর্তনে শুভ চিন্তার পাশাপাশি অশুভ চিন্তা বা অশুভ শক্তিও ভূমিকা রেখেছে। লোভ ও ব্যক্তিস্বার্থ এদের মধ্যে প্রধান। কৃষির অগ্রগতির ফলে উৎপাদন যখন সামাজিক চাহিদা ছাড়িয়ে গেল তখন এই উদ্বৃত্ত উৎপাদন কেউ কেউ নিজ দখলে নেওয়ার প্রবণতা দেখাতে লাগলেন। নানা যুক্তিতে মালিকানা দাবি করলেন। সহজেই বোঝা যায় অধিকতর চতুর ও শক্তিমান ব্যক্তিই এরকম করতে পারতেন। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সমাজপ্রধানদের কেউ কেউ এ পথে পা বাড়ালেন। অধিক চতুর এই ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা শুধু সামাজিক সম্পদই কুক্ষিগত করলেন না, সম্পদ ও শক্তির জোরে এক সময় ঘোষণা করলেন যে এরপর থেকে আর সমাজপ্রধান নির্বাচিত করার প্রয়োজন নেই, বংশানুক্রমে সমাজপ্রধান হবেন। এর ফলে দুটি বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তন ঘটল। এক. সম্পদের উপর ব্যক্তিমালিকানা স্থাপিত হলো; দুই. বংশানুক্রমিক সামন্ততন্ত্র কায়েম হলো। সমাজপতি ভূ-পতি হলেন, কৃষককুল প্রজা হলো। নিয়ম হলো প্রজারা তাদের উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ খাজনা হিসেবে সামন্ত প্রভু তথা–জোতদার, জমিদার বা রাজাকে দিতে বাধ্য থাকবেন। সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো অগ্রগতি না হলেও একদিকে কৃষিপণ্যের বৈচিত্র্য বেড়েছিল, অন্যদিকে কৃষিপণ্য বিপণন প্রসারিত হয়েছিল। কৃষি কৌশলের উন্নয়নের প্রয়োজনে এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন মানবিক চাহিদা মেটাতে কৃষিভিত্তিক শিল্প যেমন– বস্ত্র, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিযন্ত্র ইত্যাদির একে একে বিকাশ ঘটল। উৎপাদনের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ বাড়তে লাগল।

পাঠ ৩ : কৃষি ও কৃষকের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা

কৃষি আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কৃষির মাধ্যমে আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন ইত্যাদি পূরণ হয়ে থাকে।

খাদ্য : আমাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য একান্ত প্রয়োজন। খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্যই কৃষির উৎপত্তি হয়েছিল। এখনও আমাদের দেশে কৃষির প্রধান লক্ষ্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। মানুষের

জীবন বাঁচানোর জন্য খাদ্য প্রয়োজন। আর খাদ্য উৎপাদনের জন্য মানুষ সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।

বস্ত্র : বস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল আঁশ ফসল। তুলা ও পাট আমাদের প্রধান আঁশ ফসল। পশুর চামড়া ও পশম দিয়েও বস্ত্র তৈরি হয়। আঁশ ফসল উৎপাদনে কৃষি ও কৃষকের বড় ভূমিকা রয়েছে। পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্য রক্ষায় উপযোগী বলে বিশ্বব্যাপী আঁশ ফসলের উপর মানুষ নির্ভরশীল হচ্ছে। আমাদের দেশেও তুলা উৎপাদন এলাকা প্রতিবছর বেড়ে চলেছে।

বাসস্থান : সারা পৃথিবীজুড়েই বিশেষ করে গ্রামীণ বাসস্থান এখনো বহুলাংশে কৃষিনির্ভর। শুধু বাসস্থানই নয়, সেখানে ব্যবহার্য আসবাবপত্রের নির্মাণ সামগ্রীও যোগান দেয় কৃষক।

স্বাস্থ্য : স্বাস্থ্য রক্ষায় সুষম খাদ্য অপরিহার্য। এই সুষম খাদ্যের যোগান দেয় কৃষি। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ রোগব্যাধি নিরাময়ে ঔষধি উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এই ভিত্তিতে বাংলাদেশে ভেষজ, আয়ুর্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্র প্রসার লাভ করায় এই সকল ঔষধি গাছের চাষও প্রসার লাভ করে। তাই কৃষি ও কৃষকের অবদানও প্রসারিত হয়। নানা কারণে স্বাস্থ্য রক্ষায় বর্তমানে ঔষধি গাছপালা ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। এই সকল ঔষধি গাছের চাষও তাই বাড়ছে এবং লাভজনক হচ্ছে। এদের মধ্যে অ্যালোভেরা (ঘৃতকুমারী), স্টিভিয়া, কালোজিরা, রসুন এগুলো বেশ খ্যাতি লাভ করেছে। চিরতা, লবঙ্গ এমন আরও অনেক চাষযোগ্য ঔষধি গুল্ম, লতা, বৃক্ষের একটা বড় তালিকা তৈরি করা যায়। মাঠ ও উদ্যান ফসলের রোগ-বালাই চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে নিম ও আলামান্ডা গাছের পাতার রস এবং রসুনের রসের ব্যবহার সুফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে। আবার বাসক ও তুলসী পাতার রস খেলে কাশি ভালো হয়। থানকুনি ও পাথরকুচি পাতার রস আমাশয় রোগ নিরাময় করে। এই সকল উদ্ভিদজাত ঔষধের বড় গুণ হচ্ছে এগুলো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত এবং পরিবেশবান্ধব।

শিক্ষা : আখের ছোবড়া, বাঁশ ও গেওয়া কাঠ থেকে লেখার কাগজ তৈরি হয়। ধুন্দল কাঠ থেকে পেন্সিল তৈরি হয়।

চিত্র – ১.৩ : ঔষধি উদ্ভিদ

বিনোদন : কৃষি আমাদের সংস্কৃতির একটি বড় অংশ। আমাদের দেশের ঋতুবৈচিত্র্যের মতোই আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বিনোদনের সঙ্গে কৃষি ও কৃষকের সম্পর্ক রয়েছে। পল্লিগীতি, জারিসারি, ভাটিয়ালি, কবিগান, যাত্রাপালা সৃষ্টিতে কৃষি ও কৃষি সমাজের অবদান রয়েছে। ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়ার জটিল কাজ কৃষকরা দল বেঁধে ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, জারিসারি গাইতে গাইতে আনন্দের সাথে করে থাকেন। নবান্নে নতুন চালের পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায়।

কাজ : নিচের কোন কৃষিজ উপকরণ থেকে কোন দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় তা বাছাই করে খাতায় লেখ।	
কৃষিজ উপকরণ	উৎপন্ন দ্রব্যাদি
ধান, তুলা, পাট, খড়/নাড়া, বাঁশের টুকরা, রসুন, কালোজিরা, নিম, তুলসী, ঘৃতকুমারী (Aloevera)	চাল, চিড়া, মুড়ি, সুতা, কাপড়, সুতলি, চট, মাথাল, ঘরের মডেল, ট্যাবলেট, তেল, ক্যাপসুল, কাশির ঔষধ, সাবান ও কসমেটিকস

পাঠ– ৪ : কৃষি পরিবেশ, বাংলাদেশের ঋতুচক্র ও কৃষিজ উৎপাদন

বাংলাদেশের ঋতুচক্র ও কৃষিজ উৎপাদন

বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। এ দেশে ঋতু নিরপেক্ষ ফল হিসেবে কলা ও পেঁপের নাম উল্লেখ করা যায়। বাঁশ, কাঠ, বেত ছাড়া প্রায় প্রতিটি মাঠ ও উদ্যান ফসল ঋতু নির্ভর। ইদানীং সারা বছর ভোক্তার চাহিদা মেটাতে কৃষিবিজ্ঞানীরা ঋতু নিরপেক্ষ ফসলের জাত উদ্ভাবনে গবেষণা চালাচ্ছেন। বেশ কিছু ঋতু নিরপেক্ষ ফল, ফুল, শাক–সবজি ও মাঠ ফসল ইতোমধ্যেই কৃষক পর্যায়ে এসেছে। ভবিষ্যতে এর সংখ্যা দ্রুতই বাড়বে আশা করা যায়। আউশ ধান হিসেবে পরিচিত ধানগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত বেশ কিছু 'ব্রি' ধান ঋতু নিরপেক্ষ। পাট দিবা দৈর্ঘ্যের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল বলে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি থেকে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অবশ্যই বীজ বুনতে হয়। ফাল্গুনের শুরুতেই বোরো ধানের বীজতলায় বীজ থেকে চারা তৈরি করতে হয়। ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহ থেকে চৈত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাঠে চারা রোপণ করে ফেলতে হয়।

বাজারে চাহিদা থাকায় এখন সারা বছর পাটশাক, ধনে পাতা, পুঁইশাক, ডাঁটাশাক, লালশাক, লাউ, কুমড়া, পটোল, ঢেঁড়স, টমেটো ইত্যাদি সবজি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ছে।

মাটি : বাংলাদেশের নদী অববাহিকাগুলোতে বেলে–দোআঁশ মাটির প্রাধান্য থাকলেও বেশ কিছু উঁচু অঞ্চল আছে যার মাটি লালচে ও এঁটেল। আবার হাওর অঞ্চলগুলোতে কালো, জৈব পদার্থযুক্ত মাটির প্রাধান্য দেখা যায়। এই মাটি বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় প্লাবিত থাকে। মাটির পার্থক্যের প্রভাবে কৃষিও বৈচিত্র্যময় হয়।

কৃষি মৌসুম : বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ হলেও কৃষি ঋতু তিনটি। যথা– রবি (শীতকাল), খরিপ–১ (গ্রীষ্মকাল) ও খরিপ–২ (বর্ষাকাল)। ঋতু ভেদে ফসল উৎপাদনে ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন– শীতকালে শাক সবজি ও গ্রীষ্মকালে ফলমূলের উৎপাদন বেশি হয়। বিশেষ করে জৈষ্ঠ্য মাসে দেশীয় নানা সুমিষ্ট ফলমূলের সমাহার বেশি থাকে বলে একে মধু মাসও বলা হয়।

বাংলাদেশের অবস্থানগত পরিবেশ

বাংলাদেশ পৃথিবীর উপক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে জলজ মেঘমালা উৎপন্ন হয়। সেই মেঘমালা মৌসুমি বায়ুবাহিত হয়ে উত্তরের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে বাধা পেয়ে প্রচুর বৃষ্টি ঝরায়। আবার এই পর্বতমালা দেয়ালের মতো শীতকালে সাইবেরিয়ার হিমশীতল বায়ু প্রবাহ আটকে দেয়, ফলে শীতও কম হয়। এ কারণেই আমাদের দেশ জীববৈচিত্র্য, বিশেষ করে উদ্ভিদবৈচিত্র্যের দেশ হিসেবে পরিচিত।

পাঠ– ৫ : কৃষিজ উৎপাদনে বৈচিত্র্য

বাংলাদেশের কৃষিতে বৈচিত্র্য : বাংলাদেশের উদ্ভিদ ও প্রাণিবৈচিত্র্য বহুমাত্রিক। এ দেশে বিভিন্ন শস্য, ফুল, ফল, শাক, সবজি, নির্মাণ সামগ্রী, তন্তু, ঔষধিগাছ প্রভৃতি উৎপাদন করা যায়। অপরদিকে রকমারি পশু-পাখি ও মৎস্য বৈচিত্র্যেও আমাদের দেশ পিছিয়ে নেই। ফলে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি প্রাণিজ পণ্যও প্রচুর উৎপাদিত হয়।

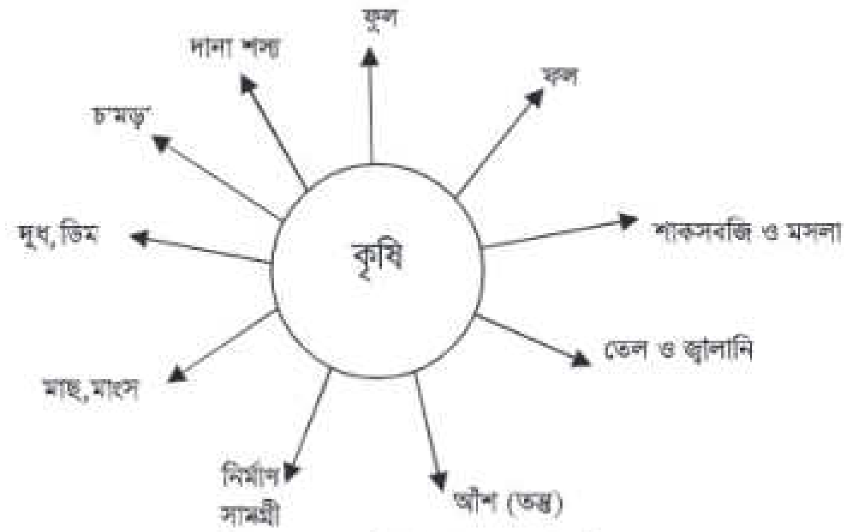

চিত্র–১.৪ : কৃষি উৎপাদনে পণ্যবৈচিত্র্য

মাঠ ফসলের বৈচিত্র্য : খোলা মাঠে যে সকল ফসল উৎপাদন করা যায় এদের সাধারণভাবে মাঠ ফসল বলা হয়। ধান, পাট, গম, আখ, বিভিন্ন রকম ডাল, ইত্যাদি মাঠ ফসলের উদাহরণ। বাংলাদেশ একটি অন্যতম পাট উৎপাদনকারী দেশ। অতীতে এ পাটকে সোনালি আঁশ বলা হতো। কারণ পাট রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হতো। বর্তমানে আবার পাট উৎপাদনের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করা যায় অল্প সময়েই পাট আমাদের জাতীয় উৎপাদন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে সম্মানজনক স্থান দখল করবে। মাঠ ফসলবৈচিত্র্যে আমাদের দেশ খুবই সমৃদ্ধ। ধানের দেশ বাংলাদেশে পঞ্চাশ বছর আগেও প্রায় দুইশত জাতের ধান জন্মাত। কৃষির আধুনিকায়নের ফলেও ফসলবৈচিত্র্য কমতে পারে। সামাজিক-রাজনৈতিক কারণেও ফসলবৈচিত্র্য কমার উদাহরণ আমাদের দেশে আছে। যেমন উচ্চফলনশীল জাতের চাষাবাদ করতে

গিয়ে অনেক জাতের ধান হারিয়ে গেছে। বাংলাদেশে মাত্র একশত বছর আগেও নানা জাতের কার্পাস তুলা জন্মাত। সূক্ষ্ম এক প্রকার কার্পাস তুলা এদেশে জন্মাত যা দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত মসলিন কাপড় উৎপাদন করা যেতো। এই তুলার জাতটি সম্ভবত পৃথিবী থেকেই বিলুপ্ত হয়েছে। যদিও বিভিন্ন প্রকার তুলা উৎপাদন আমাদের দেশে আবার বেড়ে চলেছে। প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নানা সূত্রে নতুন নতুন উদ্ভিদ তথা ফুল, ফল, সবজি এ দেশে আসছে। এসব নতুন গাছপালা আমাদের মাঠ ফসলের সাথে সাথে উদ্যান ফসল ও সামাজিক বনবৃক্ষের বৈচিত্র্যও বাড়াচ্ছে।

পাঠ–৬ : উদ্যান ফসলের বৈচিত্র্য

ফল, ফুল, শাক–সবজি, মসলা ইত্যাদি উদ্যান ফসলের মধ্যে বিবেচিত।

ফল : কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। এ দেশে বন্যার পানি জমে না এমন উঁচু এলাকায় কত বিচিত্র ধরনের কাঁঠাল জন্মায় তার হিসাব এখনো করা হয়নি। কাঁঠালের পরই জনপ্রিয় ফল হচ্ছে আম, আনারস। এ সকল ফলও আমাদের দেশে প্রচুর উৎপাদিত হয়। কমলা, কলা, কুল ও কদবেলের বৈচিত্র্যও চোখে পড়ার মতো। কলা ও পেঁপে সারা বছর পাওয়া যায়। বেশিরভাগ ফল মৌসুমি। এছাড়াও আমাদের দেশে নানা ধরনের স্বাদ ও গন্ধের লেবু চাষ হয়। সম্প্রতি আমাদের দেশে বিদেশি ফল স্ট্রবেরির চাষ বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আমাদের মাটি ও জলবায়ু এ ফল চাষের উপযোগী।

সবজি ও শাক : এ দেশে সকল ঋতুতে রকমারি সবজি উৎপাদিত হয়। বিশেষ করে শীতকাল বা রবি মৌসুমে সবজির বৈচিত্র্য অনেক বেশি। শাকের বৈচিত্র্যও এ দেশে কম নয়। শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, গোলআলু, ব্রোকলি, লাউ, ওলকপি, মুলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন সবজির মধ্যে চালকুমড়া, পটোল, করলা, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, ধুন্দল, মুখিকচু অন্যতম। শাকের মধ্যে রয়েছে লাল শাক, পুঁইশাক, পালংশাক, পাটশাক, কলমিশাক ইত্যাদি। আবার পেঁপে, কাঁচাকলা, বেগুন, লালশাক ইত্যাদি শাকসবজি সারা বছর ধরে চাষ করা হয়।

ফুল : এ দেশে অভিজাত গোলাপ থেকে শুরু করে গাঁদা, বেলি, যুঁই ইত্যাদি শত শত রকমের ফুল জন্মায়। আমাদের দেশের সকল ফুলের নাম জানেন ও চেনেন এমন মানুষ বিরল। এক সময় দু–চারটি ফুলের গাছ নেই এমন গৃহস্থবাড়ি খুঁজে পাওয়া ছিল ভার। এ জন্যই হয়তো সম্প্রতি এ দেশে পণ্য হিসেবে ফুল কেনাবেচা চালু হয়েছে। ফুল উপহার পেলে সন্তুষ্ট হয় না এমন মানুষ বিরল। ফুল আমাদের সংস্কৃতির আনন্দময় অংশ। নগরায়ণের চাপে ফুল লাভজনক পণ্য হওয়ার বাংলাদেশের কৃষিতে ক্রমশ ফুল উৎপাদন ও বিপণন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি বিদেশেও ফুল রপ্তানি করা হচ্ছে।

মসলা : উষ্ণ–আর্দ্র অঞ্চলে অবস্থান বলে আমরা মসলাপ্রিয় জাতি। আমাদের দেশে মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, তেজপাতা, ধনে ইত্যাদি রকমারি মসলা উৎপাদিত হয়।

জ্বালানি : বাংলাদেশে জ্বালানির যোগানও কৃষিক্ষেত্র থেকে আসে। পাট, ধইঞ্চা, ভুট্টা, অড়হর, ডাল ও বিভিন্ন উদ্যান ফসলের গাছ শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তুষ একটি ভালো জ্বালানি। এছাড়া উদ্যান ও বনজ বৃক্ষের কাঠও জ্বালানি হিসেবে জনপ্রিয়।

ভোজ্যতেল : সরিষা আমাদের উল্লেখযোগ্য তেল ফসল। গত কয়েক দশক যাবৎ সূর্যমুখী, সয়াবিনও তেল ফসল হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সম্প্রতি চালের কুঁড়া থেকে বাণিজ্যিকভাবে তেল উৎপাদন হচ্ছে।

অন্যান্য তেল : চিনাবাদাম, কালোজিরা ইত্যাদি তেলবীজ ফসলও ঐতিহাসিক কাল থেকেই দেশের কৃষিবৈচিত্র্যের অঙ্গ।

ঔষধি : হরেক রকমের ঔষধি উদ্ভিদ সমৃদ্ধ আমাদের দেশ। নিম, তুলসী, অ্যালোভেরা, শতমূলী হলো ঔষধি উদ্ভিদ। এছাড়া রসুন, হলুদ, কালোজিরা, লবঙ্গ ঔষধ ও প্রসাধনী তৈরির কাঁচামাল।

নির্মাণ সামগ্রী : বাঁশ, কাঠ, বেত ইত্যাদি নির্মাণ সামগ্রীর বৈচিত্র্যও এদেশে বেশ রয়েছে।

শিল্পের কাঁচামাল : বিভিন্ন প্রকার কাঠ, পাট, তুলা, নীল, আগর ইত্যাদি উদ্ভিদ এবং পশুর চামড়া, শিং, হাড় ইত্যাদিও শিল্পের কাঁচামাল ও কৃষিবৈচিত্র্যের অংশ।

কাজ : দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নিচের ছকটি পূরণ কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

ফসলের নাম	মাঠ ফসল	উদ্যান ফসল
ধান, টমেটো, পাট, গম, আখ, লাউ, ভুট্টা, আম, কাঁঠাল, গাজর।		

পাঠ– ৭ : কৃষিতে প্রাণিজ উৎপাদনের বৈচিত্র্য

মাছ : বাংলাদেশ নদী, খাল, বিল, হাওর, বাঁওড়ের দেশ। ফলে প্রাকৃতিকভাবেই মিঠা পানির মাছের বৈচিত্র্যধন্য এই দেশ। হয়তোবা এ কারণেই বাঙালির খাদ্য তালিকায় মাছ একটি প্রিয় বস্তু। বাঙালির একটি পরিচয় 'মাছে–ভাতে বাঙালি'। মাছ পালন ও উৎপাদন তাই আমাদের কৃষির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পুকুরসহ বিভিন্ন জলাশয়ে মাছ চাষ লাভজনকও বটে। চাষ করা মাছের সম্পূরক খাদ্য উৎপাদন হিসেবে তাই 'ফিশ ফিড' নামক একটি সহায়ক কৃষিশিল্পও গড়ে উঠেছে।

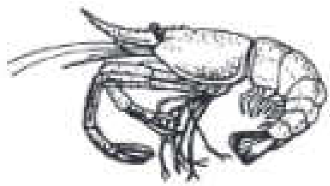

চিত্র–১.৫ : চিংড়ি

দেশের দৈনন্দিন মাছের চাহিদার একটি বড় অংশ এখন চাষ করা মাছ থেকে আসে। এটা ভবিষ্যতে ক্রমাগত বাড়তে থাকবে বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। প্রথম প্রথম রুই, কাতলা, মৃগেল জাতীয় মাছ চাষ হতো। যতই দিন যাচ্ছে এই চিত্রটি বদলে যাচ্ছে। গত কয়েক বছর যাবৎ পরিমাণের দিক থেকে এবং বাজারে সহজপ্রাপ্যতার দিক থেকে পাঙ্গাশ এবং তেলাপিয়া মাছ জনপ্রিয়। চাষযোগ্য মাছের

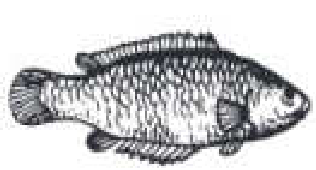

চিত্র–১.৬ : কৈ মাছ

তালিকায় বর্তমানে আরও যোগ হয়েছে পাবদা, কৈ, মাগুর, মলা ইত্যাদি সুস্বাদু মাছ। উপকূলীয় অঞ্চলের লোনা পানিতে বাগদা ও মিঠা পানিতে গলদা চিংড়ির চাষ করা হচ্ছে। এগুলো বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

কাঁকড়া : খাদ্য হিসেবে কাঁকড়া বাংলাদেশে জনপ্রিয় না হলেও রপ্তানির জন্য দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে এর উৎপাদন হচ্ছে।

মুরগি ও ডিম : আমাদের দেশে বিশেষ করে স্বাধীনতার পর থেকে খামারে মুরগি উৎপাদন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। অবশ্য গৃহস্থ পরিবারে মুরগি ও ডিম উৎপাদনের ঐতিহ্য বহুকালের। দেশি মুরগির মাংস সুস্বাদু কিন্তু ডিম কম দেয়। খামারে মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য যেমন মুরগির পৃথক জাত ব্যবহার হয় তেমনি পালন পদ্ধতিও ভিন্ন।

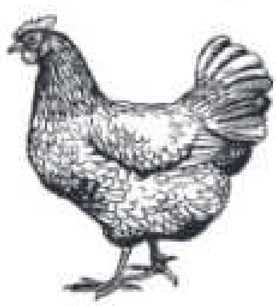

চিত্র- ১.৭ : মুরগি

হাঁস ও হাঁসের ডিম : হাওর, বাঁওড়, বিল এলাকায় তো বটেই এ ছাড়াও সারা দেশেই যেখানে পুকুর, ডোবা অর্থাৎ পানি আছে সেখানেই হাঁস চাষ কৃষক পরিবারে জনপ্রিয়। নানা জাতের হাঁস চাষ করা হয়। এদের মধ্যে 'খাকি ক্যাম্বেল' জাতীয় হাঁস ডিম উৎপাদনের জন্য জনপ্রিয়।

অন্যান্য পাখি : লাভজনক অর্থাৎ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কবুতর পালন এ দেশে অনেক আগে থেকেই জনপ্রিয়। বর্তমানে কোয়েল ও কোয়েলের ডিম উৎপাদন কৃষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে।

ছাগল : যাবর কাটা পশুদের মধ্যে গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে এ দেশে ছাগল বেশ জনপ্রিয়। আমরা ছাগল থেকে দুধ, মাংস ও চামড়া পেয়ে থাকি। নানা জাতের ছাগল পোষা হলেও সবচেয়ে জনপ্রিয় এদেশীয় জাতটির নাম 'ব্ল্যাক বেঙ্গল'। এটি মাঝারি আকার ও শান্ত স্বভাবের প্রাণী।এর মাংস খুবই সুস্বাদু এবং চামড়া উন্নত।

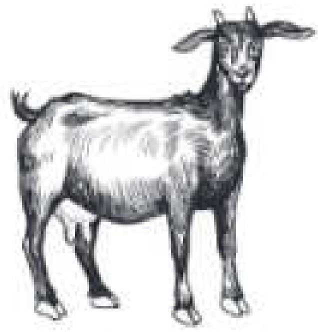

চিত্র- ১.৮ : ছাগল

ভেড়া : সারা দেশে ভেড়া দেখতে পাওয়া গেলেও দেশের কিছু কিছু এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে ভেড়ার চাষ হয়। ভেড়ার মাংস প্রোটিনের অভাব মেটায়। ভেড়ার রোগ বালাই কম হয় এবং পালন করতে জায়গাও কম লাগে। ভেড়ার লোম থেকে উল তৈরি হয়।

গরু : পশুপালকদের সবচাইতে প্রিয় পশু হলো গরু। এর পালন সম্ভবত কৃষি সভ্যতার গোড়া থেকে। গরুর সঙ্গে কৃষকের যেন আত্মিক সম্পর্ক। বাংলাদেশের স্থানীয় গরুর জাতগুলো আকারে ছোট হলেও এর খাদ্য চাহিদা কম এবং এরা বেশ রোগবালাই সহিষ্ণু। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গরুও বিশেষ করে বেশি দুধ উৎপাদনের কারণে এ দেশে লালনপালন করা হয়। একই কারণে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের দুধেল গরু এদেশের খামারিদের কাছে প্রিয় হয়েছে।

মহিষ : গরুর মতো মহিষও এদেশে অঞ্চল বিশেষে জনপ্রিয়। মহিষের দুধ ঘন হওয়ায় দধি ও মিষ্টান্ন শিল্পে এর বিশেষ আদর রয়েছে। নানা জাতের মহিষ এদেশে দেখা যায়।

ছাগল, ভেড়া, গরু ও মহিষের মাংস, দুধ, চামড়া, পশম ছাড়াও এদের শিং ও হাড় ব্যবহার করে নানা শিল্প–কারখানায় বিভিন্ন পণ্য উৎপাদিত হয়।

উপক্রান্তীয় অঞ্চলের নদী বিধৌত দেশ হিসেবে এ দেশের কৃষিজ উৎপাদনে বৈচিত্র্য অনেক। এগুলোর যথাযথ লালন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার এই নিম্ন আয়ের দেশটির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে।

কাজ : দলগত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের দেশের কৃষিজ প্রাণীর নামের তালিকা তৈরি কর। তোমাদের এলাকায় কোন কোন প্রাণীর চাষ হয় বা পালন করা হয় সেগুলোর নাম ও গুরুত্ব লেখ।

পাঠ ৮ : বাংলাদেশের কৃষি ও সংস্কৃতি

নবান্ন উৎসব : হাড়ভাঙা খাটুনি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের উৎকণ্ঠা, লুণ্ঠনকারি লাঠিয়ালদের লুটপাটের আশঙ্কা, রোগবালাই, পোকামাকড়ের আক্রমণ ও মহামারীর উৎকণ্ঠার পর যখন, বিশেষ করে ধান কেটে আপন বাড়ির আঙ্গিনায় এনে জড়ো করে তখন কৃষক পরিবারে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। এ ধান মাড়াই করে ঝেড়ে শুকিয়ে গোলায় তুলতে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ওদিকে মেয়েরা ব্যস্ত থাকেন ঢেকিতে নতুন ধান ভেনে চাল করা ও নতুন চাল গুঁড়ো করার কাজে। নতুন চালের গন্ধে গৃহস্থ বাড়ি ভরে উঠে।

নতুন চালের ভাতের পাশাপাশি নতুন চালের পায়েস, পিঠাপুলি তৈরি হতে থাকে। বাড়ির কাজের ছেলেরা নতুন লুঙ্গি–গেঞ্জি পায়, কাজের মেয়েরা পায় নতুন শাড়ি, চুড়ি, লেসফিতা। বাড়িতে বসেই ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে নতুন ধান দিয়ে এসব কেনা যায়। খালি হাতে কেউ ফিরে যায় না, ভিক্ষুকও না। উৎসবে মেতে উঠে সবাই। নতুন ভাতের উৎসব–নবান্ন উৎসব।

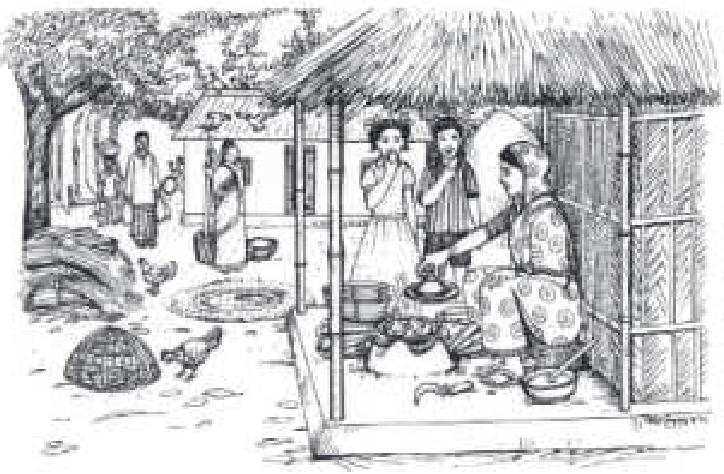

চিত্র- ১.৯ : নবান্ন

নবান্ন উৎসব কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর উৎসব না। এটা সবার উৎসব। কবে এ উৎসব হবে তা অবশ্য নির্ভর করে কোন এলাকায় হচ্ছে, কোন ফসল হচ্ছে তার উপর। যদি বোরো ধান হয় তাহলে বৈশাখে হতে পারে কারণ এ সময় বোরো ধান ঘরে আসে। এ ক্ষেত্রে নবান্ন উৎসব আর নববর্ষের উৎসব মিলেমিশে যেতে পারে। যদি আমন ধান হয় তাহলে শারদীয় উৎসবের সঙ্গে মিলে যেতে পারে। উৎসবের ঘনঘটা উভয় ক্ষেত্রেই বহুগুণ বেড়ে যায়।

বাংলা নববর্ষ: পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ। নববর্ষকে ঘিরে সবার মাঝে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। বাংলা নববর্ষ উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মেলা। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে এবং পহেলা বৈশাখ সকালে মেলা বসে। এই মেলা থেকেই গ্রামের মানুষ হাঁড়ি-ঝুড়ি, দা-কাস্তে থেকে শুরু করে সংসারের যাবতীয় তৈজসপত্র ক্রয় করে। হাট বাজারের দোকানিরাও পয়লা বৈশাখে আপ্যায়ন করেন তাঁদের গ্রাহক-খদ্দেরদের। খদ্দেররা বাকি পাওনা পরিশোধ করে মিষ্টিমুখে আপ্যায়িত হন। এই অনুষ্ঠানের আরেক নাম হালখাতা। নববর্ষের আয়োজনে যাত্রাপালা, কবিগান ও খেলাধুলার আয়োজনও করা হয়।

গ্রাম্য মেলা : নবান্ন উৎসবের অংশ হিসেবে পৌষ মাসে গ্রাম্য মেলা বসতো যা এখনও চালু আছে। এসব মেলায় যেমন নানা প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র নিয়ে পসারিরা বিক্রি করতে বসেন তেমনি এখানে তাঁতের কাপড়, লুঙ্গি, গামছা, চুড়ি, প্রসাধনী, কামার-কুমারের নানা ধাতব বা মাটির জিনিসপত্র, বইপত্র, পাটি বিক্রির জন্য উঠে। বিনোদনেরও নানা আয়োজন দেখা যায়। রাতভর চলে যাত্রা বা পালাগান। এই সব মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে। এই মেলাগুলো আসলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতির মিলন মেলা।

চিত্র- ১.১০ : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলা

কাজ : দলীয় আলোচনা কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।
১। তোমাদের এলাকায় বাংলা নববর্ষ কীভাবে পালন করা হয়?
২। তোমার দেখা একটি গ্রাম্য মেলার বর্ণনা দাও।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল .... ফসল।
২. বাংলা নববর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ....।
৩. ফল, ফুল, শাক সবজি .... ফসলের মধ্যে বিবেচিত।
৪. আদি সমাজে .... ভিত্তিতে সমাজ প্রধান নির্বাচিত হতেন।
৫. বাংলাদেশ পৃথিবীর .... অঞ্চলে অবস্থিত।

মিলকরণ

	বামপাশ	ডানপাশ
১.	কৃষির সূচনা করেছেন	খাদ্য
২.	বাংলাদেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর	নারীরা
৩.	তুলা ও পাট আমাদের প্রধান	পুরুষরা
৪.	মাটির পার্থক্যের প্রভাবে কৃষিও	আঁশ ফসল
৫.	মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর প্রথমটিই হচ্ছে	বৈচিত্র্যময় হয়
		বৈচিত্র্য বহুমাত্রিক

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উদ্যান ফসল কী?
২. নবান্ন উৎসব কাকে বলে?
৩. কৃষি উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য কী?
৪. ডিম উৎপাদনের জন্য জনপ্রিয় হাঁসের নাম লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. গ্রাম্য মেলা আমাদের দেশের 'গ্রামীণ অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক মেলা'– ব্যাখ্যা কর।
২. উদাহরণসহ বাংলাদেশে ফসল বৈচিত্র্যের অনুকূল কারণগুলোর একটি তালিকা দাও।
৩. আমাদের দেশে নবান্ন উৎসব একটি কৃষিভিত্তিক উৎসব – ব্যাখ্যা কর।
৪. পরিবার ও সমাজ গঠনে কৃষির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
৫. খাদ্য হিসেবে প্রাণিজ উৎপাদনের গুরুত্ব উদাহরণসহ আলোচনা কর।

২০১৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি ঔষধি উদ্ভিদ?

ক. ধান	খ. পাট
গ. অ্যালোভেরা	ঘ. বাঁধাকপি

২. সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায়–

i. কৃষিপণ্যের বৈচিত্র্য বেড়েছিল
ii. কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতি হয়েছিল
iii. কৃষিপণ্য বিপণন প্রসারিত হয়েছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. ii ও iii
গ. i ও iii	ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ঝুমার নানা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে ঝুড়ি ভর্তি রসাল ফলমূল নিয়ে মধু মাসে তাদের বাসায় এলেন। তারা ফলগুলো পেয়ে খুব খুশি হলো।

৩. ঝুমার নানা কোন ঋতুতে বেড়াতে আসেন?

ক. গ্রীষ্ম	খ. বর্ষা
গ. শরৎ	ঘ. হেমন্ত

ঝুমার নানার ফলের ঝুড়িতে ছিল–

i. আম
ii. কমলা
iii. কাঁঠাল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. ii ও iii
গ. i ও iii	ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রফিক ব্যবসায় লোকসান করে শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসেন। ছয় সদস্যের পরিবারের দৈনিক চাহিদা পূরণে রফিকের হিমশিম অবস্থা। গ্রামে কৃষিজ সম্পদের মধ্যে তাঁর ছোট্ট একটি বসতবাড়ি ছাড়া মাঝারি একটি পুকুর ও ৫০ শতাংশ ফসলি জমি আছে। এ অবস্থায় চাচা আলতাফ মাস্টারের পরামর্শমতো তিনি তার একটি কৃষিজ সম্পদ ব্যবহারের উদ্যোগ নেন। এতে তিনি পরিবারের দৈনন্দিন প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবেও লাভবান হন। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ ব্যবহারেরও উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক. কৃষিকে পেশা হিসেবে নেওয়ার আগে মানুষ কয়টি উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করত?

খ. কলাকে ঋতু নিরপেক্ষ ফল বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. রফিক যে উপায়ে তাঁর কৃষিজ সম্পদ ব্যবহার করে লাভবান হয়েছিলেন তা বর্ণনা কর।

ঘ. রফিক কৃষিজ সম্পদ ব্যবহারের যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করেন তা আমাদের খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন কর।

২. রহিম মিয়া তাঁর জমিতে বিভিন্ন প্রকার মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসলের চাষ করেছেন। নতুন ধান উঠায় তার পরিবারসহ সবাই নবান্ন উৎসবে মেতে উঠল।

ক. মানুষ কখন আগুনের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ শিখেছিল?

খ. পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

গ. রহিম মিয়ার কার্যক্রম কীভাবে খাদ্য চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উল্লিখিত উৎসবের সাথে রহিম মিয়ার কৃষিকাজের সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কৃষি প্রযুক্তি

আমরা প্রযুক্তির যুগে বাস করছি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। কৃষিকাজ একটি বৈজ্ঞানিক কাজ। এই কাজকে সহজ করার জন্য অনেক প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়েছে। কৃষকেরা এখন এই প্রযুক্তিগুলো ফসলের মাঠে যেমন ব্যবহার করছেন তেমনি উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশবৃদ্ধিতেও ব্যবহার করছেন। আবার গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে প্রযুক্তি যেমন ব্যবহার করছেন, তেমনি মাছ চাষেও ব্যবহার করছেন। বিজ্ঞানের গবেষণা যত এগুচ্ছে প্রযুক্তির উদ্ভাবনও ততই বাড়ছে।

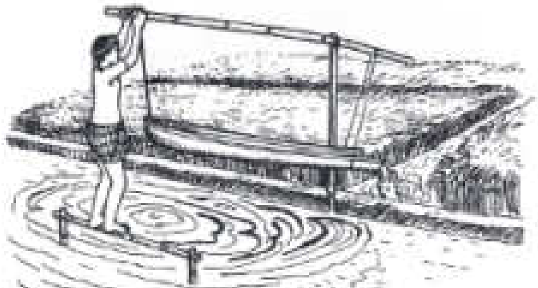

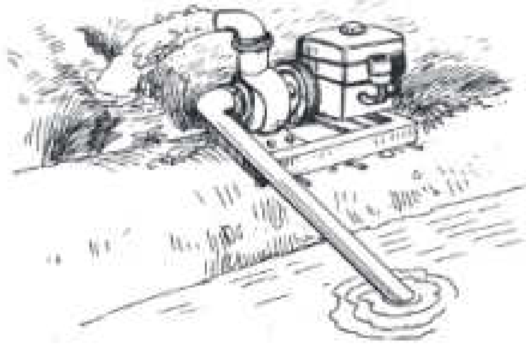

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- কৃষিতে ব্যবহৃত মাঠ প্রযুক্তিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশবৃদ্ধিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বিশ্লেষণ করতে পারব।

কৃষিতে ব্যবহৃত মাঠ প্রযুক্তি

পাঠ– ১ : পানি সেচের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি

সেচের প্রয়োজনীয়তা

আমরা জানি জমিতে পানির ঘাটতি হলে সেচ না দিলে ফসল উৎপাদন সম্ভব নয়। কিন্তু এই সেচের পানিরও অপচয় হয়। সেচের পানির উৎস ভূনিম্নস্থ হোক অথবা ভূউপরিস্থ হোক, সবই কোনো না কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়। এতে কৃষকের শ্রমের ব্যয় হয় এবং অর্থেরও ব্যয় হয়। তাই কোনোভাবেই সেচের পানির অপব্যয় বা অপচয় যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থাৎ সেচের পানির অপচয় রোধ করার মাধ্যমে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা যায়।

বিভিন্নভাবে সেচের পানির অপচয় হয়। কীভাবে সেচের পানির অপচয় হয় তা নিচে উল্লেখ করা হলো–

১। বাষ্পীভবন
২। পানির অনুস্রবণ
৩। পানি চুয়ানো

বাষ্পীভবন : সূর্যের তাপে প্রতিনিয়ত খাল–বিল, নদী–নালা থেকে যেমন পানি বাষ্পীভূত হচ্ছে তেমনি ফসলের জমির সেচের পানিও বাষ্পীভূত হচ্ছে। পানির এই বাষ্পীভবন রোধ করা কঠিন ব্যাপার। তবে সময়মতো এবং পরিমাণমতো পানি সেচ দিতে হবে যাতে ফসল নিজ প্রয়োজনে পানি গ্রহণ করতে পারে।

পানির অনুস্রবণ : সেচের পানি মাটির স্তর ভেদ করে সোজাসুজি নিচের দিকে চলে যাওয়াকে পানির অনুস্রবণ বলা হয়। অনুস্রবণের মাধ্যমে সেচের পানির অনেক অপচয় হয়। সেচের নালায় বা জমিতে শক্ত স্তর না থাকলে সহজেই পানির অনুস্রবণ ঘটে। অতএব, নালা বা জমিতে শক্ত স্তর সৃষ্টি করে পানির অনুস্রবণ রোধ করা যায়।

পানি চুয়ানো : পানি চুয়ানো পানির অনুস্রবণের অনুরূপ। শুধু পার্থক্য হলো অনুস্রবণের মাধ্যমে পানি নিচে চলে যায়। আর চুয়ানোর মাধ্যমে পানি অন্য ক্ষেতে চলে যায়। অনেক ইঁদুর আইলের এপাশ–ওপাশ গর্ত করে। ইঁদুরের গর্তের মাধ্যমেও পানি চুইয়ে অন্যত্র চলে যায়। অতএব, শক্ত মাটি দ্বারা এমনভাবে ক্ষেতের আইল ও নালা করতে হবে যেন পানি চুইয়ে না যায়। জমিতে ইঁদুর যাতে গর্ত করতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে পারলে পানি চুয়ানো কমে যাবে।

সেচের কার্যকারিতা বৃদ্ধি

ফসলের প্রয়োজনের সময় সেচ দিলে সেচের পানির কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। সেচের পানির কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রযুক্তিসমূহ উল্লেখ করা হলো–

১। পরিমাণমতো পানি সেচ দিতে হবে।
২। সময়মতো পানি সেচ দিতে হবে।
৩। জমির চারদিকে ভালোভাবে আইল বেঁধে সেচ দিতে হবে।
৪। বিকেলে বা সন্ধ্যাবেলা পানি সেচ দিতে হবে।
৫। সারিবদ্ধ ফসলের ক্ষেতে দুই সারির মধ্যবর্তী স্থানে পানি সেচ দিতে হবে।
৬। মাটির বুনট বিবেচনা করে সেচ প্রদান করতে হবে।
৭। সেচ নালা ভালোভাবে মেরামত করে সেচ দিতে হবে অথবা পাকা সেচ নালা তৈরি করতে হবে।
৮। উপযুক্ত পদ্ধতিতে সেচ দিতে হবে।
৯। সেচ নালা ফসলের দিকে ঢালু করে তৈরি করতে হবে।
১০। ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ করতে হবে।
১১। মাটিতে পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ প্রয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশের প্রধান সেচ প্রকল্প : কৃষকের কৃষিকাজের সুবিধার জন্য বাংলাদেশের সরকার অনেকগুলো সেচ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পগুলো পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। যেসব এলাকায় সেচ প্রকল্প আছে সেসব এলাকার কৃষকেরা সারা বছর আউশ, আমন, বোরো, পাট, গম, আলু, শাক–সবজি ও ফলমূল উৎপাদন করছেন। আবার শস্য বহুমুখীকরণ কৃষি পদ্ধতিও চালু করা হয়েছে। প্রকল্পগুলোর নাম নিচে উল্লেখ করা হলো–

১। গঙ্গা–কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প (জি.কে.প্রজেক্ট)
২। বরিশাল সেচ প্রকল্প (বি.আই.পি)
৩। ভোলা সেচ প্রকল্প
৪। ঠাকুরগাঁও গভীর নলকূপ সেচ প্রকল্প
৫। চাঁদপুর সেচ প্রকল্প (সি.আই.পি)
৬। মুহুরী সেচ প্রকল্প (এম.আই.পি)
৭। পাবনা সেচ এবং পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পি.আই.আর.ডি.পি)
৮। মেঘনা–ধনাগোদা সেচ প্রকল্প
৯। কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (কে.আই.পি)

কাজ : তোমরা গ্রামের ফসলের মাঠ ঘুরে দেখ কীভাবে সেচের পানির অপচয় হচ্ছে। আর কৃষকেরা অপচয় রোধের জন্য কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এ বিষয়ের উপর একটি প্রতিবেদন লিখে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : মাঠ প্রযুক্তি, বাষ্পীভবন, অনুস্রবণ

পাঠ– ২ : সেচ পদ্ধতি

বিভিন্নভাবে জমিতে পানি সেচ দেওয়া যায়। কীভাবে পানি সেচ দেওয়া হবে তা নির্ভর করে জমির মাটির প্রকার, ভূমির প্রকৃতি, পানির উৎস, ফসলের ধরন ইত্যাদির উপর। নিচে কয়েকটি সেচ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হলো–

১। প্লাবন সেচ　　২। নালা সেচ　　৩। বর্ডার সেচ
৪। বৃত্তাকার সেচ　　৫। ফোয়ারা সেচ

প্লাবন সেচ : এই পদ্ধতিতে সমতল জমিতে খাল, বিল বা পুকুর হতে আসা পানি দিয়ে প্রধান নালার সাহায্যে সেচ দেওয়া হয়। সেচের পানি যাতে আশেপাশের জমিতে যেতে না পারে সেজন্য জমির চারদিকে আইল বাঁধতে হয়। এভাবে সেচ দিলে–

১। অল্প সময়ে অধিক জমিতে সেচ দেওয়া যায়।
২। জমির মধ্যে নালার দরকার হয় না।
৩। সমতল জমির জন্যে প্লাবন সেচ কার্যকর।
৪। শ্রম ও সময় উভয়ই কম লাগে।
৫। রোপা ফসল বা শস্য ছিটিয়ে বোনা জমিতে প্লাবন সেচ কার্যকর হয়।
৬। জমি যদি ঢালু হয় তবে আইল বেঁধে পানি আটকাতে হয়।

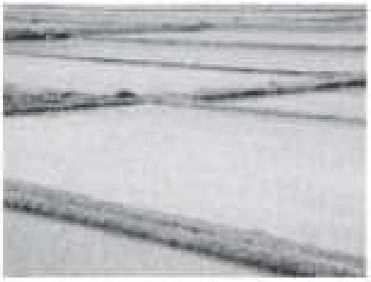

চিত্র- ২.১ : প্লাবন সেচ

নালা সেচ : নালা সেচ পদ্ধতিতে জমির ঢাল অনুযায়ী ভূমির বন্ধুরতা বা উঁচু নিচু সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নালা তৈরি করা হয়। অতঃপর প্রধান নালার সাথে জমির এ নালাগুলোর সংযোগ করে সেচ দেওয়া হয়। নালার গভীরতা ও দৈর্ঘ্য জমির উঁচু নিচুর উপর নির্ভর করে। জমি সমতল হলে নালার দৈর্ঘ্য বেশি হবে আর জমির ঢাল বেশি হলে দৈর্ঘ্য কম হবে।

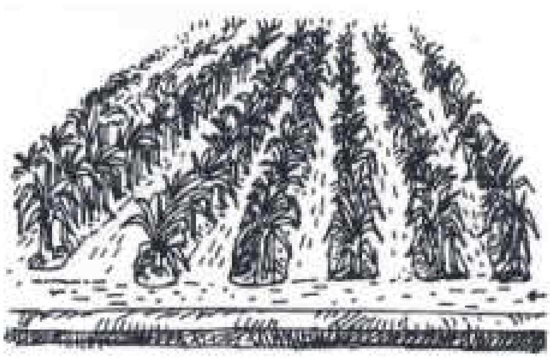

চিত্র–২.২ : নালা সেচ

এভাবে সেচ দিলে–

১। সেচের পানি নিয়ন্ত্রণ সহজ হয় ও জলাবদ্ধতার ভয় থাকে না।
২। সমস্ত জমি সমানভাবে ভিজানো যায়।
৩। পানির অপচয় কম হয়।
৪। মাটির ক্ষয় কম হয়।
৫। একই পরিমাণ পানি দ্বারা প্লাবন অপেক্ষা অধিক জমিতে সেচ দেওয়া যায়।

বর্ডার সেচ : বর্ডার সেচ পদ্ধতিতে জমির ঢাল ও বন্ধুরতা অনুযায়ী ফসলের জমিকে কতগুলো খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রধান নালা থেকে জমির খণ্ডগুলোতে পানি সরবরাহ করা হয়। প্রতিটি খণ্ডে প্রধান নালা থেকে পানি প্রবেশের পথ আছে। একটি খণ্ডে পানি সেচ দেওয়া হলে এর প্রবেশপথ বন্ধ করে পরবর্তী খণ্ডে পানি সরবরাহ করা হয়। এই পদ্ধতিতে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনেরও ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ জমি থেকে ঢালের দিকে নালা কেটে পানি নিকাশ করা হয়।

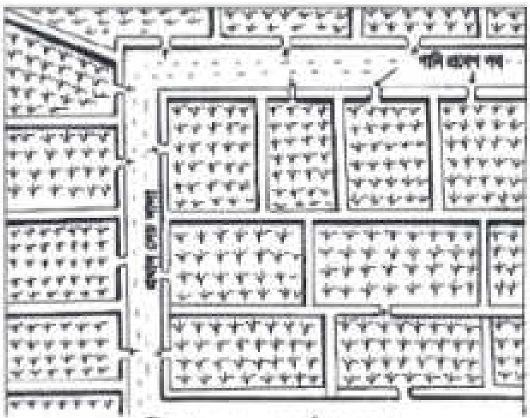

চিত্র-২.৩ : বর্ডার সেচ

এই পদ্ধতিতে সেচ দিলে–

১। পানি ব্যবস্থাপনা সহজ হয়।

২। পানির অপচয় হয় না।

৩। মাটির ক্ষয় কম হয়।

বৃত্তাকার সেচ : এই সেচ পদ্ধতিতে সমস্ত জমিতে সেচ না দিয়ে শুধু যে স্থানে গাছ রয়েছে সেখানেই পানি সরবরাহ করা হয়। সাধারণত বহুবর্ষজীবী ফলগাছের গোড়ায় এই পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হয়। ফল বাগানের মাঝ বরাবর একটি প্রধান নালা কাটা হয়। অতঃপর প্রতি গাছের গোড়ায় বৃত্তাকার নালা কাটা হয় এবং প্রধান নালার সাথে সংযোগ দেওয়া হয়।

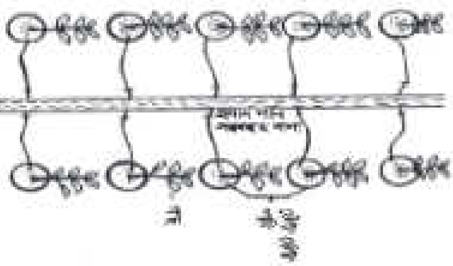
চিত্র-২.৪ : বৃত্তাকার সেচ

এই পদ্ধতিতে সেচ দিলে–

১। পানির অপচয় হয় না।

২। পানি নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।

ফোয়ারা সেচ : ফসলের জমিতে বৃষ্টির মতো পানি সেচ দেওয়াকে ফোয়ারা সেচ বলে। শাক–সবজির ক্ষেতে এই পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হয়। আমাদের দেশে বীজতলায় কিংবা চারা গাছে ঝাঁঝরি দিয়ে যে সেচ দেওয়া হয় তাও ফোয়ারা সেচ।

চিত্র-২.৫ : ফোয়ারা সেচ

কাজ : ফসল বা সবজির মাঠ পরিদর্শনে যাও এবং দেখ কীভাবে কৃষকেরা সেচ দিচ্ছেন। ব্যবহৃত সেচ পদ্ধতির উপর প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : সেচ, প্লাবন সেচ, নালা সেচ, বর্ডার সেচ, বৃত্তাকার সেচ

পাঠ– ৩ : পানি নিষ্কাশনের ধারণা ও উদ্দেশ্য

পরিমিত পানি সেচ যেমন ফসলের জন্য ভালো তেমনি অতিরিক্ত পানি ফসলের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ফসলের জমি থেকে অতিরিক্ত পানি অপসারণ করাকেই পানি নিষ্কাশন বা পানি নিকাশ বলে। ফসলের জমিতে জমে থাকা পানি অধিকাংশ ফসলের জন্য ক্ষতিকর। ধানের জমিতে পানি জমে থাকা উপকারী হলেও পেঁপে গাছ জমে থাকা পানি সহ্য করতে পারে না। ফসলের জমিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের বেশি সময় ধরে গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে গাছ মারা যায়। আবার পানি জমে থাকা ফসলের জমি থেকে পানি নিকাশ না করা পর্যন্ত সেখানে বীজ বপন করা যায় না, চারা রোপণ করা যায় না এবং গাছও লাগানো যায় না। সুতরাং পানির অভাব হলে গাছে পানি দিতে হবে। জমিতে বৃষ্টির পানি জমে থাকলে কিংবা সেচের পানি বেশি হলে অতিরিক্ত পানি তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে।

অতিরিক্ত পানির ক্ষতিকর দিক : অতিরিক্ত পানি ফসলের ক্ষেতে জমে থাকলে কী কী ক্ষতি হয় তা নিচে উল্লেখ করা হলো –

১. মাটিতে ফসলের শিকড় এলাকায় বায়ু চলাচলের বিঘ্ন ঘটে। ফলে অক্সিজেনের অভাবে শিকড় তথা গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

২. দীর্ঘদিন পানি জমে থাকার ফলে মাটির রন্ধ্র পরিসর পানি পূর্ণ হয়ে পড়ে এতে অক্সিজেন শূন্য হয়ে ফসলের শিকড় পঁচে গাছ মারা যায়।

৩. উপকারী অণুজীবের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অন্যদিকে রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের সংখ্যা ও সংক্রমণ বাড়ে।

৪. কোনো কোনো পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্যতা কমে যায়।

পানি নিকাশের উদ্দেশ্য

পানি নিকাশের উদ্দেশ্য হলো–

১. মাটিতে বায়ু চলাচল বাড়ানো।

২. গাছের মূলকে কার্যকরী করা।

৩. উপকারী অণুজীবের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

৪. মাটির তাপমাত্রা সহনশীল মাত্রায় আনা।

৫. মাটিতে 'জো' আনা।

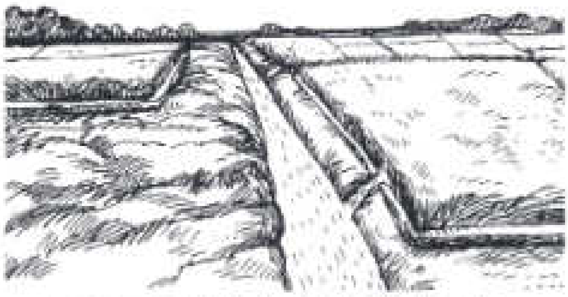

চিত্র-২.৬ নালা পদ্ধতি দ্বারা পানি নিষ্কাশন

২০১৫

পানি নিকাশের ব্যবস্থা

পানি নিকাশের জন্য নিচের ব্যবস্থাগুলি নেওয়া যায়-

১. কাঁচা নিকাশ নালা তৈরি করা।

২. পাম্পের সাহায্যে নিকাশ করা।

৩. পাকা সেচ নালা তৈরি করা।

৪. অতিরিক্ত পানির উৎসমুখে বাঁধ দেওয়া।

৫. পানির গতি পরিবর্তন নালা তৈরি করা।

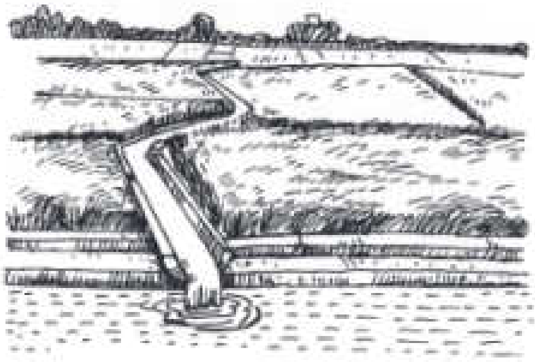

চিত্র–২.৭ : পাকা সেচ নালা দ্বারা পানি নিষ্কাশন

কাজ : পেঁপে বাগানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশনের উপযুক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে দলগত আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : পানি নিষ্কাশন, মাটিতে 'জো' আনা, অণুজীব, শিকড় এলাকা

পাঠ–৪ : মাছের পুকুরের পানি শোধন

পুকুরে মাছ চাষ অতি পরিচিত কৃষি প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির সফল ব্যবহার তখনই সম্ভব যখন পুকুরের পরিবেশ মাছের জন্য স্বাস্থ্যকর এবং বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। পুকুরের পরিবেশ বলতে জলজ আগাছামুক্ত স্বাদু পানিবিশিষ্ট পুকুরকে বোঝায়। পুকুর থেকে মাছের ভালো উৎপাদন পেতে হলে পুকুরের পরিবেশ তথা পানির গুণাগুণ রক্ষা করা খুবই জরুরি।

নানা কারণে পুকুরের পানি দূষিত হতে পারে। আর পানি দূষিত হলেই এতে অক্সিজেনের অভাব ঘটে এবং পানিতে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। রোগ–জীবাণুরও প্রাদুর্ভাব ঘটে। ফলে মাছ মারা যায়, কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরিবেশও দূষিত হয়। কাজেই মাছকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহের জন্য এবং বিষক্রিয়া ও অন্যান্য রোগ–জীবাণু থেকে বাঁচানোর জন্য পুকুরের পানি শোধন করা দরকার। নিচে পুকুরের পানির গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার কারণ ও শোধন পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

১। **দ্রবীভূত অক্সিজেনের অভাব** : দ্রবীভূত অক্সিজেনের অভাব পুকুরের একটি সাধারণ সমস্যা। সকালে বা বিকালে অথবা দিনের যেকোনো সময়ে, মেঘলা দিনে এবং কোনো কোনো সময় বৃষ্টির পর পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। এর সুস্পষ্ট লক্ষণ হলো অক্সিজেনের অভাবে মাছ পানির

২০২১

উপর ভেসে খাবি খায় ও ক্লান্ত হয়ে পানির উপরিভাগে ঘোরাফেরা করে। অক্সিজেনের বেশি অভাব হলে মাছ মরতে শুরু করে। এসময় কৃষকের ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। পুকুরে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে নিচে উল্লিখিত প্রযুক্তি গ্রহণ করে সুফল পাওয়া যায়।

ক) পুকুরে সাঁতার কেটে অক্সিজেনের অভাব দূর করা : পুকুরের পানি খুবই শান্ত থাকে। এক স্থানের পানি অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয় না। ফলে পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত হয় না। এই অবস্থায় পুকুরে সাঁতার কাটার ব্যবস্থা করলে অক্সিজেনের অভাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সাঁতার কাটার জন্য কিশোর-কিশোরীদের পুকুরে নামিয়ে দেওয়া যায়।

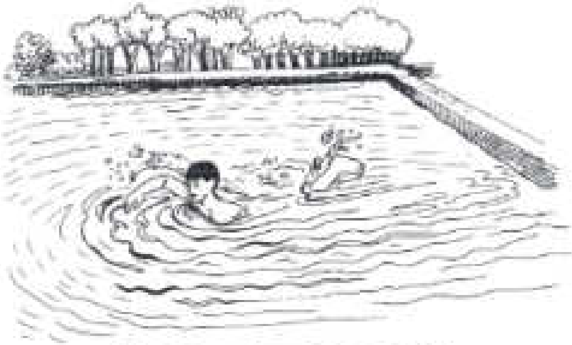

চিত্র-২.৮ : পুকুরে সাঁতার কাটা

খ) বাঁশ দ্বারা পুকুরের পানিতে আঘাত করা : বাঁশ দ্বারা পুকুরের শান্ত পানিতে আঘাত করলে পানিতে তোলপাড় হয় ও ঢেউ উৎপন্ন হয়। ফলে পানিতে বাতাসের অক্সিজেন দ্রবীভূত হয় ও সমস্যা দূর হয়। ক্রমাগত বাঁশ দিয়ে আঘাত করে পুকুরের এক পাড় থেকে অন্য পাড় পর্যন্ত পৌঁছালে সুফল পাওয়া যায়।

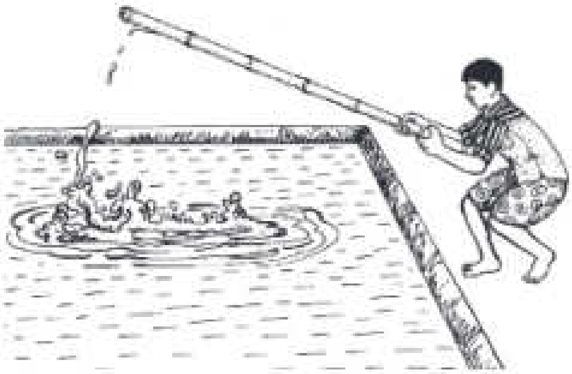

চিত্র-২.৯ : বাঁশ দ্বারা পুকুরের পানিতে আঘাত করা

২। **পুকুরের পানি ঘোলা হওয়া :** বিভিন্ন কারণে পুকুরের পানি ঘোলা হয়। ক্ষুদ্র মাটির কণা পুকুরের পানি ঘোলা করে। আবার পুকুরের পাড় ধুয়ে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করেও পানি ঘোলা হয়। ক্রমাগত কয়েকদিন বৃষ্টি হলে চতুর্দিক থেকে বৃষ্টির পানি পুকুরে প্রবেশ করে এবং পানি অধিক ঘোলা হয়। পুকুরের ঘোলা পানি শোধনের জন্য নিচের প্রযুক্তি গ্রহণ করা যায়–

ক) শতক প্রতি ১–২ কেজি চুন প্রয়োগ করে ঘোলা পানি থিতিয়ে স্বাভাবিক করা যায়।

খ) শতক প্রতি পুকুরের পানির ৩০ সেমি গভীরতার জন্য ২৪০ গ্রাম ফিটকিরি প্রয়োগ করে ঘোলা পানি থিতানো যায়।

গ) সবচেয়ে সহজ প্রযুক্তি হলো শতক প্রতি ১২ কেজি খড় পুকুরের পানিতে রাখা।

৩। **পুকুরের পানির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব :** পুকুরের পানির পি এইচ মান নির্ণয় করে অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের মাত্রা বোঝা যায়। পি এইচ মিটারের সাহায্যে এটি নির্ণয় করা হয়। পি এইচ মান ৭ এর কম হলে পানি অম্লীয় হয় এবং এর বেশি হলে ক্ষারীয় হয়। পুকুরের পানিতে অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের গ্রহণযোগ্য মাত্রা হলো ৬.৫ থেকে ৮.৫। অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব গ্রহণযোগ্য মাত্রার কম-বেশি হলে মাছ চাষে সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন কম হলে মাছের ফুলকায় পচন ধরে আর বেশি হলে মাছের খাদ্য চাহিদা কমে যায় এবং মাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে মাছ সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। পুকুরের পানির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব স্বাভাবিক মাত্রায় আনার জন্য নিচের পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা যায়।

ক) **চুন প্রয়োগ :** অম্লত্ব বেড়ে গেলে শতক প্রতি ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে।

খ) **তেঁতুল বা সাজনা গাছের ডাল ব্যবহার :** ক্ষারত্বের মাত্রা বেড়ে গেলে পুকুরের পানিতে ৩-৪ দিন তেঁতুল বা সাজনা গাছের ডাল ভিজিয়ে রাখা যায়।

৪। **পানির উপর সবুজ শেওলার স্তর :** পুকুরের পানিতে সবুজ শেওলার স্তর পড়েও পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়। এতে পানির রং ঘন সবুজ হয়। ফলে মাছের স্বাভাবিক চলাফেরায় ব্যাঘাত ঘটে। শেওলা পচে পানিতে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। অতঃপর মাছ পানির উপরিভাগে খাবি খায়। পানির এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য নিচে উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক) **তুঁতে বা কপার সালফেট প্রয়োগ :** শতক প্রতি ১২-১৫ গ্রাম তুঁতে বা কপার সালফেট প্রয়োগ করা।

খ) **চুন প্রয়োগ :** শতক প্রতি ১ কেজি চুন প্রয়োগ করেও সুফল পাওয়া যায়।

কাজ : গ্রামের পুকুরগুলো ঘুরে দেখ। আর দেখ কীভাবে পুকুরের পানি দূষিত হচ্ছে। দূষিত পুকুরের মাছগুলো বাঁচাবার জন্য কৃষকেরা কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন তা দেখ এবং লেখ।

নতুন শব্দ : অক্সিজেন, পানি শোধন, ঘোলা পানি থিতানো, ফিটকিরি

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশবৃদ্ধিতে ব্যবহৃত কৃষি প্রযুক্তি

পাঠ-৫ : বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি

উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধিতে প্রথম যে প্রযুক্তির কথা বলতে হয় তা হচ্ছে উচ্চফলনশীল জাতের বীজ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান শাকসবজি, গম, সরিষা, আলু ইত্যাদি ফসলের অনেক উন্নত এবং উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভাবন করেছে। শাকসবজির মধ্যে টমেটো, বেগুন, লাউ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মরিচ এসবের নাম উল্লেখযোগ্য। এসব উন্নত জাতের সবজির বীজ কৃষকেরা পাচ্ছেন এবং ব্যবহার করছেন। গ্রীষ্মকালেও

টমেটোর চাষ করতে পারছেন। বারমাসব্যাপী বেগুন ও লাউয়ের চাষ করছেন। আরও কতো কী। এর ফলে কৃষকেরা ভালো আয় করছেন।

বাংলাদেশে ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত ৭৮টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এর সাথে আরও ধানের জাত যুক্ত করেছে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। উচ্চফলনশীল ধানের জাতের অবদান হিসেবে বলা যায় বাংলাদেশ এখন প্রায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিচে কয়েকটি ধানের জাতের নাম উল্লেখ করা হলো।

আউশ : বি আর ৯ (সুফলা), বি আর ১৪ (গাজী), বি আর ১৬ (শাহী বালাম) ইত্যাদি।

আমন : বি আর ১১ (মুক্তা), ব্রি ধান ৩০, ব্রি ধান ৩৩, ব্রি ধান ৪০, ব্রি ধান ৪৪ ইত্যাদি।

বোরো : ব্রি ধান ২৮, ব্রি ধান ২৯, ব্রি ধান ৩৬, ব্রি হাইব্রিড–১, ব্রি ধান ৫০ (বাংলামতি) ইত্যাদি।

বীজ উৎপাদন একটি প্রযুক্তিগত কর্মকান্ড। বীজ উৎপাদনের প্রথম কাজ হলো বীজের গুণাগুণ সংরক্ষণ করা। তাই কৃষিবিজ্ঞানীরা অবিরাম ফসলের জাতের বংশবৃদ্ধি ও গুণাগুণ সংরক্ষণের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছেন এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি সংযোগ করছেন। বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি বলতে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণকে বোঝায়। মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানীরা নিচে উল্লিখিত শর্তসমূহ মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।

১। **বীজের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ** : বীজের পরিচিতি এর জন্মসূত্র থেকে। অতএব, বীজ উৎপাদনের সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন আকাঙ্ক্ষিত বীজের সাথে অন্য জাতের বীজের মিশ্রণ না ঘটে।

২। **বীজ ফসলের পৃথকীকরণ** : বীজ ফসলের জমিকে অবীজ ফসলের জমি থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার নামই পৃথকীকরণ। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাই বীজ ফসলের চারদিকে বর্ডার লাইন হিসেবে একই ফসলের অতিরিক্ত চাষ করতে হয়। এতে পর–পরাগায়নের সম্ভাবনা থাকে না।

৩। **বীজ শোধন** : বীজ জীবাণু বহন করতে পারে। সেজন্য জমিতে বপনের আগে বীজ শোধন করে নিতে হয়। বীজ শোধন করার জন্য অনেক ঔষধ ব্যবহার করা হয়। যেমন, গ্রানোসান–এম, ভিটাভেক্স–২০০ ইত্যাদি।

৪। **বীজ বপন পদ্ধতি** : বীজ সময়মতো বপন করতে হবে। আর বীজ বপনের সময় জমিতে যথেষ্ট রস থাকা প্রয়োজন। সাধারণত বীজ ফসল নির্দিষ্ট দূরত্বে লাইনে বপন বা রোপণ করা ভালো। লাইনে বীজ বপনের জন্য বীজ বপনযন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫। **রগিং :** বীজের জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য রগিং একটি জরুরি কাজ। রগিং অর্থ হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত বীজের গাছ ছাড়া আগাছাসহ অন্য যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত গাছ জমি থেকে শিকড়সহ তুলে ফেলা। ফুল আসার আগেই অনাকাঙ্ক্ষিত গাছ রগিং করা ভালো।

৬। **আন্তঃ পরিচর্যা**

১. বীজের জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

২. যথাসময়ে কীটপতঙ্গ দমন করতে হবে।

৩. পরিমাণমতো পানি সেচ দিতে হবে।

৭। **বীজ ফসল কর্তন :** বীজ যখন পরিপূর্ণভাবে পরিপক্ক হয় ও বৃষ্টিবাদলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না তখনই বীজ ফসল কর্তন করতে হয়। বীজ ফসল কাটার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে মাড়াইঝাড়াই করতে হবে।

৮। **বীজ শুকানো ও সংরক্ষণ :** বীজ এমনভাবে শুকাতে হবে যাতে বীজে অতিরিক্ত আর্দ্রতা না থাকে। যেমন, ধানের বীজে শতকরা ১২ ভাগ আর্দ্রতা থাকতে পারে। ভালোভাবে শুকানোর পর বীজ সংরক্ষণের জন্য মাটি অথবা ধাতব পাত্রে রাখতে হবে। পাত্রটি অবশ্যই শুষ্ক, পরিচ্ছন্ন হতে হবে। বীজে যাতে কীটপতঙ্গ আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য ম্যালাথিয়ন স্প্রে করা যেতে পারে।

মানসম্মত বীজের উৎপাদন

মানসম্মত বীজ তিন ধাপে উৎপাদন করা হয়।

যথা– ১) মৌল বীজ

২) ভিত্তি বীজ

৩) প্রত্যয়িত বীজ।

কৃষকের প্রত্যয়িত বীজ ছাড়া অন্য বীজ ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি কেউ ফসল উৎপাদনে প্রত্যয়িত বীজ ছাড়া সারহীন বীজ ব্যবহার করেন তবে ফসল ভালো না হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই বিশেষজ্ঞরা প্রত্যয়িত বীজ ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করেন। নিচে বীজ উৎপাদনের ধাপগুলো আলোচনা করা হলো-

চিত্র–২.১০ : প্রত্যয়িত বীজ

মৌল বীজ : উদ্ভিদ প্রজনন বিজ্ঞানীদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বংশগত গুণাগুণ সম্পন্ন যে বীজ উৎপাদন করা হয় তাকে মৌল বীজ বলে। মৌল বীজ সাধারণত কম পরিমাণে উৎপাদন করা হয়। এ বীজ বিক্রয়যোগ্য নয়।

ভিত্তি বীজ : বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের খামারে বীজ অনুমোদন সংস্থার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মৌল বীজ থেকে যে বীজ উৎপাদন করা হয় তাকে ভিত্তি বীজ বলে।

প্রত্যয়িত বীজ : ভিত্তি বীজ থেকে বীজ অনুমোদন সংস্থার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যে বীজ উৎপাদন করা হয় তাকে প্রত্যয়িত বীজ বলে। এই বীজ কৃষকদের ব্যবহারের জন্য অনুমোদন সংস্থা অনুমোদন প্রদান করে। প্রত্যয়িত বীজ কৃষকদের নিকট বিক্রি করা হয়।

কাজ –১: কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চুক্তিবদ্ধ কৃষকের খামারে যাও আর দেখ তারা মানসম্মত বীজ উৎপাদনের শর্তগুলো মেনে বীজ উৎপাদন করছে কিনা।

কাজ– ২: তোমার কৃষি শিক্ষকের সাথে পরিকল্পনা করে সব শিক্ষার্থী মিলে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যাও আর দেখ মৌল বীজ কীভাবে উৎপাদন করছে।

নতুন শব্দ : বীজের বিশুদ্ধতা, পৃথকীকরণ, বীজ শোধন, রগিং, মৌল বীজ, ভিত্তি বীজ, প্রত্যয়িত বীজ

পাঠ - ৬ : বীজ হতে চারা উৎপাদন

বীজ থেকে চারা উৎপাদনের জন্য প্রথমত বীজতলা তৈরি করতে হবে। শীতকালীন সবজির জন্য আশ্বিন–কার্তিক মাসে আর গ্রীষ্মকালীন সবজির জন্য ফাল্গুন–চৈত্র মাসে বীজতলা তৈরি করতে হবে। আগাম ফসলের জন্য আরও একমাস আগে থেকে বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।

টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মরিচ, পুঁইশাক, পেঁপে ইত্যাদির বীজ প্রথমে বীজতলায় ফেলে চারা উৎপাদন করতে হয়। চারার বয়স চার সপ্তাহ থেকে একমাস হলে মূল জমিতে রোপণ করা হয়। বীজতলার আকার ৩ মিটার × ১ মিটার হলে ভালো হয়। এরূপ একটি বীজতলায় জাতভেদে ১০-১২ গ্রাম বীজ দরকার।

পানির উৎসের কাছে আলো বাতাস যুক্ত উঁচু উর্বর জমিতে বীজতলা করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন বীজতলা মূল জমি থেকে কমপক্ষে ১০ সেমি উঁচুতে থাকে। দুটি বীজতলার মাঝে ৩০ সেমি নালা রাখতে হবে। বীজতলার মাটির সাথে পচা গোবর ও ১০ গ্রাম ইউরিয়া মিশিয়ে দিতে হবে। অতঃপর সাবধানে

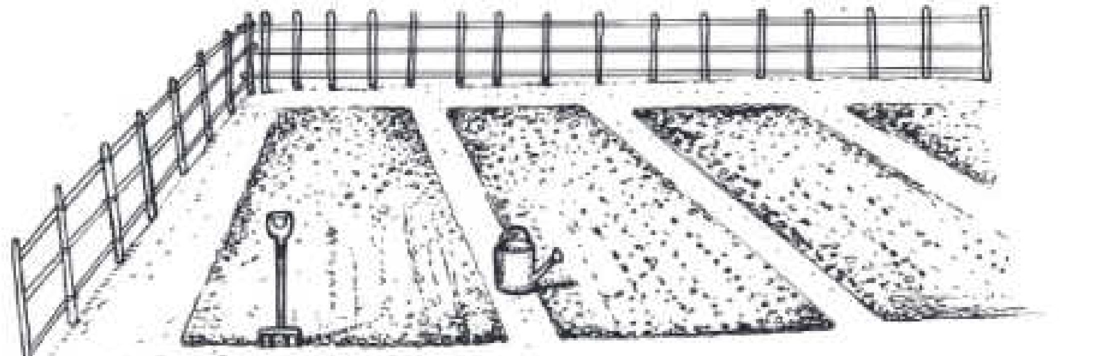

চিত্র-২.১১ : একটি আদর্শ বীজতলা

বীজ ছিটিয়ে ঝুরা মাটি দিয়ে বীজ তক্তার সাহায্যে উপরিভাগ সমান করে দিতে হবে এবং মাটি চেপে দিতে হবে। এরপর বীজতলায় প্রতিদিন নিয়মিত পানি দিতে হবে। বীজতলায় ঝাঁঝরি দিয়ে পানি দেওয়া ভালো। কেননা এতে বৃষ্টির ফোঁটার মতো সমানভাবে পানি দেওয়া যায়। তিন চার দিনের মধ্যে চারা বের হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন বীজতলা শুকিয়ে না যায়। যেসব বীজের ত্বক পুরু সেসব বীজের চারা বের হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। পুরু ত্বকের বীজ ২৪-৪৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে বীজতলায় বুনলে তাড়াতাড়ি চারা বের হবে। রোদ ও বৃষ্টি থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বীজতলার উপর ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে।

বয়স বাড়ার সাথে চারার তাপ সহ্য ক্ষমতাও বাড়ে। তবে মাটির আর্দ্রতা ঠিক রাখার জন্য ঝাঁঝরি দিয়ে সেচ দিতে হবে। বিকেল বেলা সেচ দেওয়া ভালো। অতঃপর মাটি যখন শক্ত হবে তখন নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে।

বীজতলায় পোকামাকড় ও রোগবালাই আক্রমণ করতে পারে। পোকা আক্রমণ করার আগেই কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে সাধারণভাবে ১০ লিটার পানিতে ৪ চা চামচ ম্যালাথিয়ন-৫৭ ইসি গুলে বীজতলায় ছিটাতে হবে। আর কোনো চারা রোগাক্রান্ত হলে তা তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ফুলকপি, বাঁধাকপি এসব সবজির চারা মূল জমিতে রোপণের পূর্বে দ্বিতীয় বীজতলায় রোপণ করা ভালো। চারা বড় হতে থাকলে ঝাঁঝরির পানিতে ১০ গ্রাম ইউরিয়া নিয়ে দ্রবণ তৈরি করে বীজতলায় ছিটালে চারা স্বাস্থ্যবান হয়। বীজতলায় আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য খড়কুটা বিছিয়ে দিতে হবে। চারার বয়স ৪-৫ সপ্তাহ হলে মূল জমিতে রোপণ করতে হবে।

চারা তোলার প্রস্তুতি হিসেবে প্রথমত ঝাঁঝরির সাহায্যে সেচ দিয়ে বীজতলা ভিজিয়ে নিতে হবে। অতঃপর চারা তোলার জন্য খুরপি ও চারা বহনের ঝুড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। চারা তোলার উপযুক্ত সময় হচ্ছে বিকাল বেলা। চারা সাবধানে তুলতে হবে যাতে শিকড় ছিঁড়ে না যায়। চারা তোলা হলে ঠিকমতো পরিবহন করে তৈরি করা মূল জমিতে নিতে হবে। চারা রোপণের সময় খুরপির সাহায্যে গর্ত করে বীজতলায় যেভাবে চারা ছিল ঠিক সেভাবেই গর্তে রোপণ করতে হবে।

কাজ : তোমার বাড়ির পাশে ৩ মিটার ×১ মিটারের একটি জায়গা নির্বাচন কর।

১. বীজতলায় চারা উৎপাদন কর।
২. কোদাল দিয়ে নির্বাচিত স্থানের মাটি ঝুরঝুরা করে চাষ কর।
৩. বীজতলা মাটি থেকে কমপক্ষে ১০ সেমি উঁচুতে হতে হবে।
৪. পচা গোবরের সাথে ১০ গ্রাম ইউরিয়া মিশিয়ে বীজতলার উপর ছিটিয়ে দাও এবং মিশিয়ে দাও। মাটির ২ সেমি গভীরে বীজ বপন কর।
৫. প্রতিদিন বীজতলায় ঝাঁঝরি দিয়ে পানি দাও। ৩-৪ দিনের মধ্যেই চারা বের হবে।
৬. যতদিন চারা মূল জমিতে রোপণের উপযুক্ত না হবে ততদিন এই পাঠের নির্দেশমতো বীজতলার যত্ন নাও।

নতুন শব্দ : চারা উৎপাদন, বীজতলা, ঝাঁঝরি, দ্বিতীয় বীজতলা, ম্যালাথিয়ন-৫৭ ইসি, ছাউনি, পুরু ত্বকের বীজ

পাঠ-৭ : উদ্ভিদের অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি

উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধিতে প্রযুক্তির অবদান অনেক। প্রযুক্তি প্রাচীন হোক কিংবা আধুনিক হোক, চালু প্রযুক্তির কোনোটির অবদানই অস্বীকার করা যায় না। নিচে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধিতে প্রযুক্তির অবদান তুলে ধরা হলো।

অঙ্গজ চারা উৎপাদন : প্রায় সব গাছই বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। তবে বীজ ছাড়াও গাছের বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে চারা উৎপাদন এবং বংশবিস্তার করা সম্ভব। অঙ্গজ চারার ব্যবহার কৃষিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে এবং এ থেকে কৃষকেরা অনেক লাভবান হচ্ছেন। অঙ্গজ চারা উৎপাদন প্রযুক্তির মধ্যে কর্তন বা ছেদ কলম, দাবা কলম, গুটি কলম, জোড় কলম এবং চোখ কলম প্রধান। অঙ্গজ চারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এ থেকে জন্মানো গাছে মাতৃগাছের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে। নিচে অঙ্গজ চারা উৎপাদনের কয়েকটি পদ্ধতি দেওয়া হলো। আর চারা গাছ থেকে তাড়াতাড়ি ফল পেতে হলে অঙ্গজ চারা উৎপাদন পদ্ধতির জুড়ি নেই।

১) **কর্তন বা ছেদ কলম** : এই পদ্ধতিতে শাখা, মূল, পাতা ইত্যাদি মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছায়াযুক্ত স্থানে টবে বা নার্সারির বেডে রোপণ করতে হয়। ১৫ দিনের মধ্যে তা থেকে নতুন চারা উৎপন্ন হয়। অতঃপর চারাটি অন্যত্র মূল জমিতে রোপণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার খুবই সহজ। গোলাপ, লেবু ইত্যাদি ফুল ও ফল গাছের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

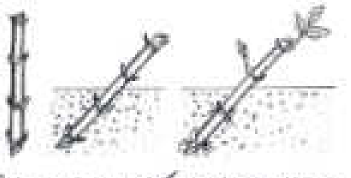

চিত্র-২.১২ : কর্তন বা ছেদ কলম

২) **দাবা কলম** : প্রথমে মাতৃগাছের মাটির নিকটে অবস্থিত শাখা নিচে নামিয়ে দুই গিটের মাঝখানের বাকল কাটতে হবে। বাকলের নিচের সবুজ অংশে ছুরির ভোতা পাশ দিয়ে চেছে ফেলতে হবে। অতঃপর কাটা অংশ মাটিতে চাপা দিতে হবে। কিছু দিন পর কাটা অংশ থেকে শিকড় গজাবে এবং নতুন চারা হবে। গজানো অংশ কেটে ২-৩ সপ্তাহ পর সাবধানে মাটিসহ উঠিয়ে অন্যত্র রোপণ করতে হয়। লেবু, পেয়ারা, গোলাপ, ইত্যাদি গাছে দাবা কলম করা হয়।

চিত্র-২.১৩ : দাবা কলম

৩) জোড় কলম : জোড় কলমের দুটি অংশ (১) রুট স্টক ও (২) সায়ন। অনুন্নত যে গাছের সঙ্গে জোড়া লাগানো হবে সে গাছটিকে রুট স্টক বলে। উন্নত জাতের গাছের যে অঙ্গ স্টকের সঙ্গে লাগানো হবে তাকে বলা হয় সায়ন। রুট স্টক ও সায়নের জোড়া লাগানো পদ্ধতিকে জোড় কলম বলে। জোড়কলম প্রধানত দু'ধরনের হয়। যেমন-যুক্ত জোড় কলম ও বিযুক্ত জোড় কলম। জোড় কলমের মাধ্যমে বর্তমানে আম, তেজপাতা, সফেদা প্রভৃতি গাছের বংশবিস্তার করা হচ্ছে।

চিত্র–২.১৪ : জোড় কলম

কাজ : ১। গোলাপের একটি ডাল কেটে ছেদ কলম তৈরির মাধ্যমে চারা তৈরি কর।
২। গুটি কলম পদ্ধতিতে রঙ্গনের একটি চারা তৈরি করে টবে রোপণ কর।

নতুন শব্দ : সুফলা, গাজী, শাহী কলম, মুক্তা, বাংলামতি, কর্তন বা ছেদ, দাবা, গুটি, জোড় কলম

পাঠ-৮ : প্রাণীর বংশবৃদ্ধি প্রযুক্তি

প্রাণিসম্পদের মধ্যে হাঁস–মুরগি অন্যতম। সুতরাং এই পাঠে হাঁস–মুরগির বংশবৃদ্ধিতে ডিম ফোটানো ও প্রাকৃতিক উপায়ে বাচ্চা ফোটানোর প্রযুক্তির অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। ডিম ফোটানোর জন্য প্রথমত উর্বর ডিম দরকার। ডিম বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো–

১। মসৃণ, মোটা ও শক্ত খোসার ডিম
২। স্বাভাবিক রঙের ডিম
৩। মাঝারি আকারের ডিম
৪। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ডিম
৫। ৫০–৬০ গ্রাম ওজনের ডিম
৬। ডিমের বয়স গ্রীষ্মকালে ৩–৪ দিন এবং শীতকালে ৭–১০ দিন

ডিম ফোটানো পদ্ধতি : ডিম ফোটানোর দুই ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। যেমন প্রাকৃতিক পদ্ধতি ও কৃত্রিম পদ্ধতি। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে হাঁস মুরগি দ্বারা ডিম ফোটানো হয়। গ্রামের গৃহস্থ বাড়িতে প্রাকৃতিক পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়। এতে অর্থের বিনিয়োগ লাগে না। অন্যদিকে তুষ পদ্ধতি বা ইনকিউবেটর পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃত্রিমভাবে ডিম ফোটানোর মাধ্যমে বাচ্চা উৎপাদন করা হয়।

চিত্র–২.১৫ : ডিম ফোটানোর প্রাকৃতিক পদ্ধতি

প্রাকৃতিক পদ্ধতি : মুরগির নিজের দেহের তাপ দিয়ে নিষিক্ত ডিম ফোটানোকে প্রাকৃতিক পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতি আমরা নিজেদের বাড়িতে দেখে থাকব। দেশি মুরগি কিছুদিন ডিম পাড়ার পর কুচে হয় এবং ডিমে তা দিতে আগ্রহী হয়। এরূপ মুরগিকে ১০–১২টি ডিম দিয়ে বসানো হয়। প্রথমত মুরগির জন্য ঝুড়িতে খড়কুটা দিয়ে একটি বাসা বানাতে হবে। বাসাটি ঘরের নির্জন কোণে রাখতে হবে। মুরগির বাসা ৩৫ সেমি ব্যাস এবং ১০ সেমি গভীর হবে। ডিমে বসানোর পূর্বে মুরগিকে ভালোভাবে খাওয়াতে হবে। মুরগির সামনে দানাদার খাবার ও পানি রাখতে হবে। ৮–১০ দিন পর ডিমগুলো সূর্যের আলোয় পরীক্ষা করতে হবে। ডিমের ভিতরে ভ্রূণ থাকলে কালো দাগের মতো দেখাবে। ২১তম দিবসে ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসবে। বাচ্চারা প্রায় দুইমাস মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকে। এরপর বাচ্চারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে।

ইনকিউবেটর যন্ত্র দ্বারা ডিম ফোটানো পদ্ধতি : প্রাকৃতিক ও ইনকিউবেটর যন্ত্র দ্বারা ডিম ফোটাতে একই সময়ের প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা হলো একসাথে অনেক সংখ্যক ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করা যায়। এই পদ্ধতিতে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর সময় রোগ নিয়ন্ত্রণ করে সুস্থ বাচ্চা উৎপাদন করা যায়। এই পদ্ধতিতে মুরগিগুলো ডিমে তা না দেওয়ার কারণে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই বাণিজ্যিকভাবে এই পদ্ধতি খামারিদের নিকট খুব জনপ্রিয়।

ইনকিউবেটর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র । এতে শত থেকে লক্ষাধিক ডিম ফোটানো যায়।

ইনকিউবেটর যন্ত্র দ্বারা বাচ্চা ফোটানোর সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করতে হবে।

১। **তাপমাত্রা:** ইনকিউবেটরের তাপমাত্রা ৯৯.৫–১০০.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট এর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উল্লেখ্য উপযুক্ত তাপমাত্রা না পেলে ভ্রূণের কোষ বিভাজন হবে না এবং ভ্রূণের মৃত্যু হবে।

২। **আর্দ্রতা:** ইনকিউবেটরের মধ্যে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা ৬৫–৭০% এর মধ্যে রাখা হয়। ইনকিউবেটরে আর্দ্রতা কম থাকলে ডিম থেকে পানি বাষ্পায়িত হয়ে ভ্রূণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩। **বায়ুপ্রবাহ:** ভ্রূণের অক্সিজেন গ্রহণ এবং ডিম থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বের হওয়ার জন্য বায়ুপ্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ইনকিউবেটরে বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে অক্সিজেনের প্রবেশ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড দূরীকরণের ব্যবস্থা থাকে। বায়ুপ্রবাহ না থাকলে ভ্রূণের মৃত্যু হয়।

৪। সেটিং ট্রেতে ডিম বসানো: সেটিং ট্রেতে ৫৫–৬০ গ্রাম ওজনের ডিম বসানো হয়। ডিমগুলোর মোটা অংশ উপরের দিকে এবং সরু অংশ নিচের দিকে থাকে। ইনকিউবেশন চলাকালীন সময়ে ডিমগুলো ৪৫ ডিগ্রি কৌণিক অবস্থানে থাকে।

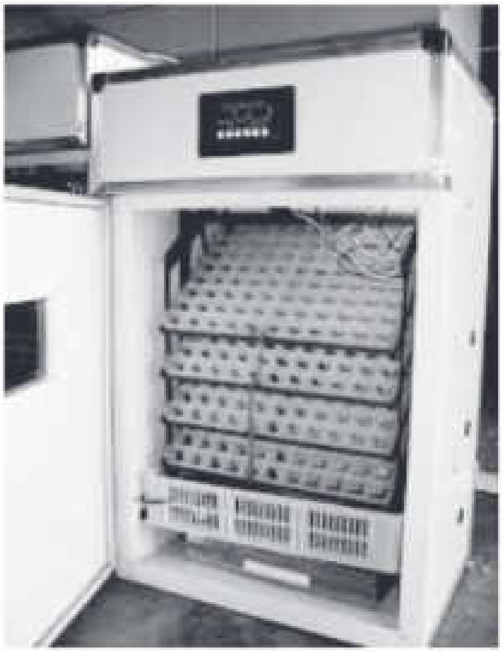

চিত্র–২.১৬: একটি ইনকিউবেটর যন্ত্র

৫। ডিম ঘুরানো: ডিমের সর্বদিকে সমানভাবে তাপ, আর্দ্রতা ও বায়ু প্রবাহ পাওয়ার জন্য ডিমগুলোকে দৈনিক ৩–৮ বার ঘুরানো হয়ে থাকে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা সম্পাদিত হয়ে থাকে।

৬। হ্যাচিং ট্রেতে ডিম স্থানান্তর : মুরগির ডিমের ক্ষেত্রে ১৮ দিন পর ডিমগুলোকে সেটিং ট্রে থেকে হ্যাচিং ট্রেতে স্থানান্তর করা হয়। হাঁসের ডিমের ক্ষেত্রে ২৫তম দিবসে সেটিং ট্রে থেকে হ্যাচিং ট্রেতে স্থানান্তর করা হয়। উল্লেখ্য সেটিং ট্রেতে বাচ্চা ফোটার কোনো সুযোগ নেই। হ্যাচিং ট্রেতে তাপমাত্রা ১–২ ডিগ্রি ফারেনহাইট কমিয়ে দিতে হবে।

৭। ডিম ক্যান্ডলিং করা: আলো দ্বারা ডিমের ভিতরের অংশ পর্যবেক্ষণ করাকে ক্যান্ডলিং বলে। ডিম বসানোর সাত দিন পর অনুর্বর ডিম ও মৃত ভ্রূণসহ ডিম পৃথক করার জন্য সকল ডিমকে ক্যান্ডলিং করা হয়। আবার ১৪তম দিবসেও ক্যান্ডলিং করে একই রকমভাবে মৃত ভ্রূণসহ ডিম পৃথক করা হয়। ভ্রূণসহ মৃত ডিম, পচা ডিম পৃথক না করলে ইনকিউবেটরের মধ্যে সুস্থ ডিম জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়।

৮। ফিউমিগেশন: এটি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করার একটি পদ্ধতি। এই ক্ষেত্রে ১০০ ঘনফুট জায়গার জন্য ৭০ সিসি ফরমালিন ও ৩৫ গ্রাম পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করা

হয়। এই মিশ্রণটি মাটির পাত্রে রেখে ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক মিশ্রণটি অত্যন্ত বিষাক্ত ধোঁয়া উৎপাদনের মাধ্যমে রোগজীবাণু ধ্বংস করে। তাই ব্যবহারের সময় দরজা জানালা বন্ধ করে সকলকেই দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করা উচিত।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে আশেপাশের কোনো মুরগির খামার পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন শেষে শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

নতুন শব্দ : ইনকিউবেটর, সেটিং ট্রে, হ্যাচিং ট্রে, ক্যান্ডলিং, ফিউমিগেশন

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বীজতলায় .... দিয়ে পানি দেওয়া ভালো।

২. পুরু ত্বকের বীজ.................. ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে বীজতলায় বুনলে তাড়াতাড়ি চারা বের হবে।

৩. হ্যাচিং ট্রেতে.................... কোণে সাজাতে হয়।

৪. শতক প্রতি .... কেজি চুন প্রয়োগ করে ঘোলাপানি থিতিয়ে স্বাভাবিক করা যায়।

মিলকরণ

	বামপাশ	ডানপাশ
১.	অজাজ বংশবৃদ্ধি	পানির ক্ষতিকর দিক
২.	পানি নিকাশ	নিরাপদ দূরত্ব
৩.	সেচ প্রকল্প	পি. আই. আর. ডি. পি
৪.	বীজ ফসলের পৃথকীকরণ	মাটিতে 'জো' আনা
		গুটি কলম

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কর্তন বা ছেদ কলম কী?

২. ডিম উৎপাদনের উদ্দেশ্য কী?

৩. পুকুরের পানি কেন শোধন করা হয়?

৪. সেটিং ট্রেতে কীভাবে ডিম বসানো হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রধান সেচ প্রকল্পগুলো কী কী?

২. পানি নিকাশ বলতে কী বোঝ? পানি নিকাশের উদ্দেশ্যসহ অতিরিক্ত পানির ক্ষতিকর দিকগুলো বর্ণনা কর।

৩. বীজ কয় ধাপে উৎপন্ন করা হয়? বিভিন্ন প্রকার বীজের বর্ণনা দাও।

৪. ডিম বাছাইয়ের ধাপসমূহ উল্লেখপূর্বক প্রাকৃতিক উপায়ে ডিম ফোটানোর পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৫. কীভাবে সেচের পানির অপচয় হয়ে থাকে? সেচের পানির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন কেন?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাচ্চা ফোটানোর জন্য নির্বাচিত ডিম শীতকালে কতদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে?

ক. ৩–৪ দিন   খ. ৪–৫ দিন

গ. ৭–১০ দিন   ঘ. ১০–১২ দিন

২. ফোয়ারা পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হয়-

i. বীজতলায়

ii. শাক–সবজির ক্ষেতে

iii. বহুবর্ষজীবী ফল গাছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii

গ. i ও ii   ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রাজিয়ার বাবা তাঁর ৫ শতকের একটি পরিত্যক্ত পুকুরে মাছ চাষের উদ্যোগ নেন এবং চাষ শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ রাজিয়া লক্ষ করে যে, পুকুরের পানি ঘন সবুজ রং ধারণ করেছে এবং মাঝে মাঝে মৃত মাছও ভেসে উঠে। ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী রাজিয়া তার বাবাকে এ সমস্যা সমাধানে পুকুরে তুঁতে বা কপার সালফেট প্রয়োগের পরামর্শ দেয়।

৩. রাজিয়ার বাবার পুকুরের জন্য প্রয়োজনীয় তুঁতে বা কপার সালফেটের পরিমাণ কত?

ক. ১২–১৫ গ্রাম খ. ২৪–৩০ গ্রাম

গ. ৪৮–৬০ গ্রাম ঘ. ৬০–৭৫ গ্রাম

৪. রাজিয়ার বাবার পুকুরে উল্লিখিত সমস্যার কারণ কী?

ক. পুকুরে শেওলার স্তর সৃষ্টি হওয়া খ. পুকুরের পানি ঘোলা হওয়া

গ. পুকুরে অতিরিক্ত চুন দেওয়া ঘ. পুকুরের পানির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব কম-বেশি হওয়া

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

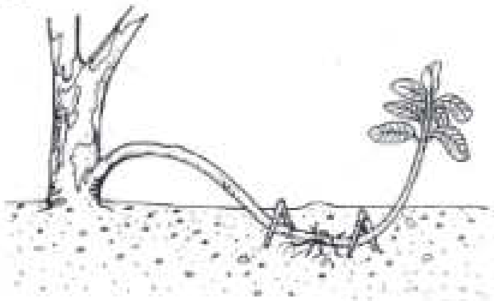

ক

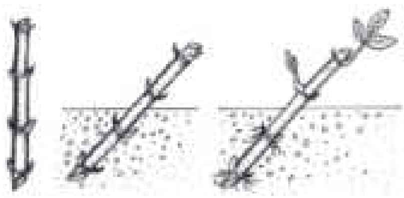

খ

ক. উদ্ভিদের অঙ্গজ বংশবিস্তার বলতে কী বোঝ?

খ. অঙ্গজ বংশবিস্তারের একটি সুবিধা ব্যাখ্যা কর।

গ. গোলাপের বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে ক ও খ চিত্রে প্রদর্শিত পদ্ধতি দুইটির মধ্যে কোনটি কার্যকরী? কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রের পদ্ধতিসমূহ ভালো ফলনে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? বিশ্লেষণ কর।

২. শ্যামল বাবু তাঁর পারিবারিক চাহিদা মেটানোর জন্য বাড়ির পাশের স্বল্প জমিতে টমেটো ও ফুলকপি চাষ শুরু করেন। এ ছাড়া বাড়ির পিছনে তাঁর ৫ বছরের পুরানো আমের একটি বাগানও আছে। শ্যামল বাবু আম বাগানে যে সেচ পদ্ধতিটি অনুসরণ করে সফলতা লাভ করেন তা তাঁর সবজি ক্ষেতে প্রয়োগ করেন। এতে সবজি বাগানে সমস্যা দেখা দেয়।

ক. পানি সেচ কেন দেওয়া হয়?

খ. সেচের পানির কার্যকারিতা বৃদ্ধির একটি প্রযুক্তি ব্যাখ্যা কর।

গ. শ্যামল বাবু যে সেচ পদ্ধতি প্রয়োগ করে চাষে সফলতা পান তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শ্যামল বাবু কীভাবে সবজি ক্ষেতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করবেন বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষি উপকরণ

আমরা পূর্ববর্তী শ্রেণিতে জানতে পেরেছি মাটি হলো উদ্ভিদের অবলম্বন এবং সার হলো তার খাবার। আমরা কি জানি এ সারে কী কী উপাদান থাকে? সার হলো উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলোর আধার। আর প্রাণীর ক্ষেত্রে শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ লবণ হলো পুষ্টি উপাদানের আধার। অন্যদিকে মাছ ও পশু-পাখির জন্য খাদ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলো থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে সম্পূরক খাদ্যের বিকল্প নেই। আবার জমিতে সার হিসেবে জৈব সারের কার্যকারিতা ও ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই জৈব সার তৈরি ও তার ব্যবহার জানা অত্যাবশ্যক।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- প্রাণী ও উদ্ভিদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মাছ ও পশু-পাখির সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- সহজলভ্য উপকরণ (যেমন-বাসাবাড়ির বর্জ্য) ব্যবহার করে জৈব সার তৈরির পদ্ধতি ও এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব;
- বালাইনাশক (জৈব ও অরাসায়নিক) ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ–১ : উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান

উদ্ভিদ তার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য মাটি, বায়ু ও পানি থেকে কতগুলো উপাদান শোষণ করে। এ উপাদানগুলোর অভাবে উদ্ভিদ সুষ্ঠুভাবে বাঁচতে পারে না। তাই লাভজনকভাবে অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য এ পুষ্টি উপাদানগুলো সার হিসেবে প্রয়োগ করে এদের অভাব পূরণ করা হয়। এ উপাদানগুলোকেই উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বলে। এ পুষ্টি উপাদানগুলোর অভাবজনিত লক্ষণ অন্য কোনো পুষ্টি উপাদান দ্বারা পূরণ করা যায় না। তাই এ পুষ্টি উপাদানগুলোকে অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান বলে। এখানে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের শ্রেণিবিভাগ, কাজ, অভাবজনিত লক্ষণ এবং পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

পুষ্টি উপাদানের শ্রেণিবিভাগ

উদ্ভিদের মোট পুষ্টি উপাদান ১৭টি। উদ্ভিদের গ্রহণমাত্রার উপর ভিত্তি করে এ পুষ্টি উপাদানগুলোকে ২টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা–

(ক) **মুখ্য পুষ্টি উপাদান** : উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এ পুষ্টি উপাদানগুলো অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মুখ্য পুষ্টি উপাদান ৯টি যথা– কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার।

(খ) **গৌণ পুষ্টি উপাদান** : উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এ পুষ্টি উপাদানগুলো অল্পমাত্রায় প্রয়োজন হয়। গৌণ পুষ্টি উপাদান ৮টি। অল্পমাত্রায় ব্যবহৃত হলেও উদ্ভিদের জীবন রক্ষার জন্য এই উপাদানগুলো অত্যাবশ্যক যথা– লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, তামা, দস্তা, বোরন, ক্লোরিন, কোবাল্ট।

পুষ্টি উপাদানের উৎস

উদ্ভিদ ২টি উৎস থেকে ১৭টি পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে। যথা– (ক) প্রাকৃতিক উৎস ও (খ) কৃত্রিম উৎস।

(ক) **প্রাকৃতিক উৎস** : মাটি, বায়ু ও পানি এ তিনটি হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎস।

মাটি : কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন ব্যতীত বাকি ১৪টি পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদ মাটি থেকে পেয়ে থাকে।

বায়ু : উদ্ভিদ কার্বন ও অক্সিজেন বায়ু থেকে গ্রহণ করে।

পানি : উদ্ভিদ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পানি থেকে পায়। এছাড়াও উদ্ভিদ পানিতে দ্রবীভূত খনিজ পদার্থও গ্রহণ করে।

(খ) **কৃত্রিম উৎস** : জৈব সার ও রাসায়নিক সার হচ্ছে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের কৃত্রিম উৎস।

জৈব সার : উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের সবগুলোই জৈব সারে পাওয়া যায়। গোবর, কম্পোস্ট, আবর্জনা, খড়কুটা ও আগাছা পচিয়ে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

রাসায়নিক সার : ইউরিয়াতে নাইট্রোজেন, টিএসপিতে ফসফরাস, এমওপিতে পটাশিয়াম এবং জিপসামে ক্যালসিয়াম ও সালফারের প্রাধান্য থাকে। এছাড়া জিঙ্ক সালফেটে জিঙ্ক ও সালফার থাকে।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে প্রতিটি দলে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম সারের নমুনা দিবেন। এ সারগুলো প্রধানত কোন কোন পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে তাদের নাম ও ৩টি করে কাজ লিখিয়ে দলীয়ভাবে উপস্থাপন করাবেন।

পাঠ–২: পুষ্টি উপাদানের কাজ

উদ্ভিদের জীবনচক্রে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান বিভিন্ন কাজ করে থাকে। নিচে উদ্ভিদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পুষ্টি উপাদানের কার্যাবলি বর্ণনা করা হলো–

নাইট্রোজেন : (১) গাছকে ঘন সবুজ রাখে (২) গাছের পাতা, কাণ্ড ও ডালপালার বৃদ্ধি ঘটায় (৩) অধিক কুশি সৃষ্টিতে সহায়তা করে (৪) শিকড় বিস্তারে সহায়তা করে।

ফসফরাস : (১) উদ্ভিদের শিকড় মজবুত করে (২) সময়মতো ফুল ফোটায় ও ফসল পাকায় (৩) ফসলের গুণগত মান বাড়ায়।

পটাশিয়াম : (১) শক্ত ও মজবুত কাণ্ড গঠনে সহায়তা করে (২) উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় (৩) উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড ও ফলের বৃদ্ধি সমুন্নত রাখে (৪) গাছের শিকড় বৃদ্ধি করে (৫) দানা জাতীয় শস্যের দানা পুষ্ট করে।

ক্যালসিয়াম : (১) উদ্ভিদের মূল গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে (২) উদ্ভিদকোষকে শক্তি প্রদান করে (৩) ডাল ফসলের ফলন বাড়ায় (৪) ফল জাতীয় শস্যের কাণ্ড শক্ত করে (৫) খাদ্যশস্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বাড়ায়।

ম্যাগনেশিয়াম : (১) সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করে (২) ফসফরাস শোষণে সাহায্য করে (৩) চর্বি ও শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে (৪) সবুজ রং রক্ষায় সহায়তা করে।

গন্ধক (সালফার) : (১) তেল জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে (২) শিম জাতীয় ফসলের মূলে নাইট্রোজেন গুটি (নডিউল) উৎপাদনে সাহায্য করে (৩) শিকড় বৃদ্ধি ও বীজ উৎপাদনে সহায়তা করে (৪) গাছের দৈহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

দস্তা (জিঙ্ক) : (১) ফুল ও ফল উৎপাদনে সহায়তা করে (২) উদ্ভিদের সবুজ কণিকা (ক্লোরোফিল) গঠনে সাহায্য করে (৩) দানা ও ফলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বাড়ায় (৪) বীজ গঠনে অংশগ্রহণ করে (৫) পেঁয়াজ, মটর প্রভৃতি ফসলের উৎপাদন বাড়ায়।

লৌহ (আয়রন) : (১) উদ্ভিদের সবুজ কণিকা (ক্লোরোফিল) গঠন করে (২) বীজ উৎপাদনে সহায়তা করে (৩) ফসলের গুণগত মান বাড়ায় (৪) বাঁধাকপি, শালগম, মুলা ইত্যাদির ফলন বৃদ্ধি করে (৫) শিকড় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্বারা নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার ও ক্যালসিয়াম নামে দল গঠন করবেন। প্রত্যেক দলকে নিজ নিজ দলের পুষ্টি উপাদানের কাজ ও তাদেরকে যে যে সারে পাওয়া যায় তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের দেখানো নমুনা সার/নমুনা উদ্ভিদ প্রদর্শন করে দলীয় কাজটি করতে পারে।

পাঠ–৩ : পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ

পুষ্টির অভাবে রোগাক্রান্ত হলে বিশেষ লক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ তা প্রকাশ করে। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ করা হলো :

উপাদান	অভাবজনিত লক্ষণ
নাইট্রোজেন	(১) গাছের পাতা হালকা সবুজ থেকে শুরু করে হলুদ বর্ণ ধারণ করে (২) ফলন অনেক কম হয়। (৩) বীজ অপুষ্ট হয় (৪) দানা জাতীয় ফসলের কুশি কম হয় (৫) গাছের শিকড়ের বিস্তৃতি কম হয় (৬) গাছের পাতা আগাম ঝরে পড়ে (৭) বীজের আকৃতি ছোট হয়।
ফসফরাস	(১) বিটপ ও মূলের স্বাভাবিক বিকাশ হয় না (২) কোষ বিভাজনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় (৩) গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না (৪) পাতা কম হয় (৫) আমিষের পরিমাণ কমে যায় (৬) ফুলের সংখ্যা কমে যায় (৭) ফলের আকার ছোট থাকে ও ফল ঝরে যায়।
পটাশিয়াম	(১) উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় (২) পোকা–মাকড়ের আক্রমণ বাড়ে (৩) সালোকসংশ্লেষণের হার হ্রাস পায় (৪) গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় (৫) গাছের পাতা তামাটে বর্ণ ধারণ করে (৬) খরা সহ্য করার ক্ষমতাও কমে যায়।

উপাদান	অভাবজনিত লক্ষণ
সালফার (গন্ধক)	(১) গাছ খর্বাকৃতির হয় (২) পাতা ছোট ও বিবর্ণ হয় (৩) ফসলের পরিপক্কতা বিলম্বিত হয় (৪) কান্ড শুকিয়ে সরু হয়ে যায় (৫) তেল জাতীয় শস্যের ফলন কমে যায় (৬) ধান গাছের বেলায় নতুন পাতা হলদে হয়ে যায় (৭) গাছের বৃদ্ধি ও কুশির সংখ্যা কমে যায়।
জিংক (দস্তা)	(১) ধান গাছের কচিপাতার গোড়া সাদা হয়ে যায় (২) গাছে ফুল ফুটতে ও ফল ধরতে বিলম্ব হয় (৩) ভুট্টা, তুলা, কমলালেবু ইত্যাদি গাছের পাতার শিরার মধ্যবর্তী স্থানে বিবর্ণতা দেখা দেয় (৪) পাতার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় (৫) লেবু গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় (৬) জমিতে কোথাও ধানের চারা বড় হয় এবং কোথাও ছোট হয় (৭) উদ্ভিদের মূল ও কান্ডের অগ্রভাগ শুকিয়ে যায়।
আয়রন (লৌহ)	(১) কচি পাতার সবুজ রং বিবর্ণ হয় (২) প্রথমে পাতার দুই শিরার মাঝখানে বিবর্ণ হয়ে সমগ্র পাতায় তা ছড়িয়ে পড়ে (৩) গাছ খর্বাকৃতির হয় (৪) সয়াবিন, কমলালেবু ও সবজি জাতীয় পাতায় পচন ধরে (৫) ধানের বীজতলার চারার নতুন পাতা হলুদ হয়ে যায়।
ক্যালসিয়াম	(১) কচি পাতার অগ্রভাগের গঠন অস্বাভাবিক হয় (২) পাতার সবুজ রং বিবর্ণ হয় (৩) পাতার কিনারায় এবং মাঝখানে হলদে ও বাদামি রং হয় (৪) পাতা ছোট থাকে (৫) গাছ খর্বাকৃতির হয় (৬) ফুল ও ফলের কুঁড়ি ঝরে যায় (৭) শিম জাতীয় ফসলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
ম্যাগনেসিয়াম	(১) পাতার দুই শিরার মধ্যবর্তী এলাকা হলুদ বর্ণ ধারণ করে (২) পাতা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় (৩) গাছের শাখা ও পাতার বোঁটা সরু হয় (৪) নতুন পাতা হালকা সবুজ, খাটো এবং সরু হয় (৫) শিমের পুরো পাতা হলুদ হয়ে যায় (৬) ক্লোরোফিল উৎপাদন ব্যাহত হয় (৭) গাছের শাখা ও পাতার বোঁটা সরু হয়।

কাজ : শিক্ষক নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও জিংকের অভাবে উদ্ভিদে বা ফসলে কী কী লক্ষণ প্রকাশ পায় তার নমুনা স্থিরচিত্র বা ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা উক্ত পুষ্টি উপাদানের অভাব কোন কোন নমুনায় প্রকাশ পেয়েছে এবং লক্ষণগুলো কী কী তা দলীয়ভাবে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ–৪ : গৃহপালিত পশুর পুষ্টি উপাদান

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি অন্যান্য প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্যও খাদ্যের প্রয়োজন। দৈহিক বৃদ্ধি, পুষ্টিসাধন, ক্ষয়পূরণ এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য খাদ্যে সকল পুষ্টি উপাদান থাকা আবশ্যক। গৃহপালিত পশুর খাদ্যে ছয়টি পুষ্টি উপাদান থাকা দরকার। নিচের ছকে পুষ্টি উপাদানের নাম, পুষ্টির উৎস ও পুষ্টির কার্যকারিতা দেখানো হলো –

পুষ্টি উপাদান	পুষ্টির উৎস	পুষ্টির কার্যকারিতা
আমিষ	ডাল, খৈল, শুঁটকি মাছের গুঁড়া, রক্ত	(১) দেহকে সুস্থ ও সবল রাখতে সহায়তা করে (২) দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে।
শর্করা	গম, ভুট্টা, খড়, চালের কুঁড়া, ঝোলা গুড়	(১) দেহে শক্তি বৃদ্ধি, তাপ উৎপাদন ও সঞ্চালন করে (২) দেহের বৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বাড়ায় (৩) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।
চর্বি বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ	খৈল, সয়াবিন, বাদাম, সূর্যমুখী, দুধ, মাছের তেল	(১) দেহে তাপ ও কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে (২) চামড়ার মসৃণতা বৃদ্ধি করে এবং চর্মরোগ প্রতিরোধ করে।
ভিটামিন	বিভিন্ন কাঁচা ঘাস, ফলমূল, শাকসবজির খোসা, গাছের পাতা	(১) চামড়া, হাড় ও দাঁতের গঠন ও সুস্থতা রক্ষার জন্য ভিটামিন ডি সহায়তা করে (২) ভিটামিন এ রোগ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।
খনিজ পদার্থ (ফসফরাস, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, দস্তা, লৌহ, ম্যাংগানিজ, কপার ও কোবাল্ট)	কাঁচা ঘাস, লবণ মিশ্রিত উদ্ভিদজাত খাদ্য	(১) দেহে নতুন টিস্যু উৎপাদনে সহায়তা করে (২) হাড়, দাঁতের গঠন ও পুষ্টি সাধন করে (৩) রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।
পানি	পুকুর, খাল, বিল, নদী, গভীর ও অগভীর নলকূপের পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানি, রসাল কাঁচা ঘাস	(১) তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে (২) খাদ্যকে দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে (৩) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে (৪) দেহের দূষিত পদার্থ মলমূত্র ও ঘামের আকারে বের করে দেয়।

গৃহপালিত পশুর সুষম পুষ্টি উপাদান

উপরে আলোচিত পুষ্টি উপাদানগুলো আনুপাতিক হারে যেসব খাদ্যে বিদ্যমান থাকে, তাকে সুষম পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্য বা সুষম খাদ্য বলে। এ খাদ্য গবাদিপশুর জন্য খুবই জরুরি। এ খাদ্য সকল পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে থাকে। এটি সুস্বাদু ও সহজপাচ্য হয়ে থাকে। এতে আঁশ জাতীয় খাদ্য (শুষ্ক ও রসাল) এবং দানাদার খাদ্য থাকে।

আঁশ জাতীয় পুষ্টি উপাদান : (ক) **শুষ্ক** : ধানের খড়, গমের খড়, সাইলেজ ও ঘাস

(খ) **রসাল** : কাঁচা ঘাস, মিষ্টি আলু, মুলা, গাজর ইত্যাদি

দানা জাতীয় খাদ্য : গম ভাঙা, ভুট্টা ভাঙা, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, খৈল, ডালের খোসা ।

কাজ : অপুষ্টিতে ভুগছে এমন গৃহপালিত পশু এবং সঠিক পুষ্টিসম্পন্ন সুস্থ গৃহপালিত পশুর স্থিরচিত্র বা ভিডিও শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে এ দুই ধরনের গৃহপালিত পশুর শারীরিক গঠন ও সুস্থতার পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে বলবেন। এ কাজটি উক্ত আলোচনা বা দলীয়ভাবে শিক্ষক করাতে পারবেন।

পাঠ–৫ : গৃহপালিত পাখির পুষ্টি উপাদান

অন্যান্য প্রাণীর মতো গৃহপালিত পাখির জন্যও ৬টি পুষ্টি উপাদান জরুরি। এখানে পুষ্টি উপাদানগুলোর উৎস এবং আরও কিছু কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. শর্করা

উৎস: শর্করার উৎসগুলো হলো গমের ভুসি, ভুট্টা ভাঙা, চালের খুদ ও কুঁড়া ইত্যাদি

কাজ : (১) ভুট্টা ভাঙা খেলে ডিমের কুসুম হলুদ হয়। (২) দেহে শক্তি বৃদ্ধি, তাপ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করে। (৩) দেহের বৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বাড়ায়। (৪) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

২. আমিষ

উৎস: আমিষের উৎসগুলো হলো খৈল (বাদাম, তিল), ডালচূর্ণ, সয়াবিন চূর্ণ, শুষ্ক গুঁড়া (শুঁটকি মাছ, পশুর নাড়িভুঁড়ি, হাড়ের গুঁড়া, রক্ত, শামুক, ঝিনুক, ছোট মাছ) ইত্যাদি।

কাজ : (১) দেহকে সুস্থ ও সবল রাখতে সহায়তা করে।(২) দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে।

৩. চর্বি/তৈল

উৎস: উৎসগুলো হলো তৈল জাতীয় শস্য, খৈল ইত্যাদি।

কাজ : (১) দেহে তাপ ও কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে।(২) চামড়ার মসৃণতা বৃদ্ধি করে এবং চর্মরোগ প্রতিরোধ করে।

৪. ভিটামিন

উৎস: উৎসগুলো হলো পালংশাক, পুঁইশাক, লেটুস, মুলা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, মাছের উপজাত, সবুজ ঘাস ইত্যাদি।

কাজ : (১) ডিমের উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। (২) চামড়া, হাড় ও দাঁতের গঠন ও সুস্থতা রক্ষার জন্য ভিটামিন ডি সহায়তা করে।(৩) ভিটামিন এ রোগ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

৫. খনিজ পদার্থ

উৎস: উৎসগুলো হলো মাংসের উচ্ছিষ্ট, শুঁটকি মাছের গুঁড়া, শামুক ও ঝিনুক চূর্ণ, লবণ, হাড়ের গুঁড়া ইত্যাদি।

১০৫

কাজ : (১) ডিমের খোসা তৈরিতে সাহায্য করে। (২) দেহে নতুন টিস্যু উৎপাদনে সহায়তা করে (৩) হাড়, দাঁতের গঠন ও পুষ্টি সাধন করে । (৪) রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

৬. পানি

উৎস: উৎসগুলো হলো সরবরাহকৃত পানি, কচি ঘাস, শাকসবজি।

কাজ : ১) তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। (২) খাদ্যকে দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে।(৩) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।(৪) দেহের দূষিত পদার্থ মলমূত্র ও ঘামের আকারে বের করে দেয়।

উল্লেখ্য যে ঝিনুক, শামুক, ছোট মাছ, কাঁকড়া, কেঁচো, পোকামাকড়, জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি হাঁসের প্রিয় খাদ্যবস্তু।

গৃহপালিত পাখির সুষম পুষ্টি উপাদান : খাদ্য গ্রহণ করে প্রতিটি জীব বেঁচে থাকে। কিন্তু এ খাদ্যে মাত্র একজাতীয় পুষ্টি উপাদান থাকলে এদের বৃদ্ধি ভালো হয় না। তাই জীবের জীবনচক্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সকল পুষ্টি উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টি উপাদানগুলোর একটির অভাব অন্যটি দ্বারা পূরণ সম্ভব নয়। সুষম মাত্রায় পুষ্টি উপাদানগুলো খাওয়ালে হাঁস-মুরগি থেকে মানসম্মত ডিম ও মাংস পাওয়া যায়। হাঁস মুরগির সুষম খাদ্যে উপরে উল্লিখিত সকল পুষ্টি উপাদান সঠিক অনুপাতে বিদ্যমান থাকে। তাই এ খাদ্য হাঁস-মুরগির জন্য খুবই প্রয়োজন।

পাঠ– ৬ : সম্পূরক খাদ্য

আমরা জেনেছি উদ্ভিদ তাদের পুষ্টি উপাদানগুলো মাটি, পানি ও বায়ু থেকে গ্রহণ করে থাকে। এ উপাদান গুলোর অভাব হলে আমরা জমিতে সার প্রয়োগ করে থাকি। কিন্তু মাছ ও পশু পাখি কোথা থেকে তাদের পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে ? উত্তরে বলব আঁশ জাতীয় খাবার ও দানাদার খাদ্য থেকে। কিন্তু এ খাবার খাওয়ার পরও মাছ, পশু পাখি থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায় না। তাই মাছ ও পশু পাখি থেকে দ্রুত ও অধিক উৎপাদন পেতে প্রচলিত খাবারের পাশাপাশি প্রতিদিনই কিছু অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এ খাদ্যই হলো সম্পূরক খাদ্য।

মাছের সম্পূরক খাদ্য : শুধু প্রাকৃতিক খাদ্যে মাছের উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। সার প্রয়োগ করে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান দিলে তাতেও মাছের পরিপূর্ণ পুষ্টি সাধন হয় না। অধিক উৎপাদন পেতে হলে পুকুরে প্রতিদিন নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। এজন্য পুকুর থেকে জাল টেনে ৩০-৪০টি মাছ ধরে গড় ওজন বের করে পুকুরের সব মাছের আনুমানিক মোট ওজন নির্ণয় করতে হবে। বড় মাছের

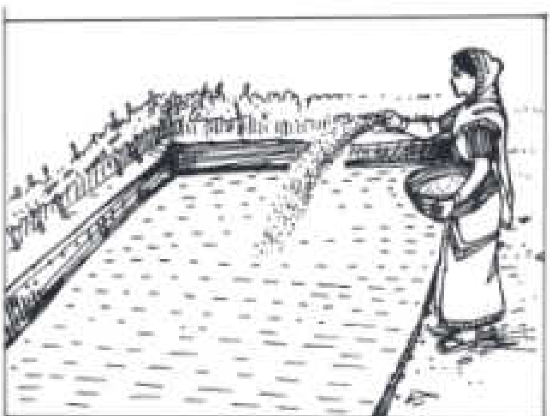

চিত্র-৩.১ : পুকুরে সম্পূরক খাদ্য দেওয়া হচ্ছে

জন্য পুকুরে অবস্থিত মাছের মোট ওজনের শতকরা ৩–৫ ভাগ হারে প্রতিদিন খাবার দেওয়া উচিত। অর্থাৎ কোনো পুকুরে সব মাছের মোট ওজন ১০০ কেজি হলে ঐ পুকুরে দৈনিক ৩–৫ কেজি হারে খাবার দিতে হবে। আর পোনা মাছকে দেহের ওজনের শতকরা ৫–১০ ভাগ হারে প্রতিদিন খাবার দেওয়া প্রয়োজন।

কার্প জাতীয় মাছের জন্য : কার্প জাতীয় মাছ যেমন– রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প ইত্যাদি চাষের ক্ষেত্রে ফিশমিল, চালের কুঁড়া, সরিষার খৈল, আটা ও ভিটামিন, খনিজ মিশ্রণ একত্রে মিশিয়ে খাদ্য তৈরি করা যায়। এজন্য খৈল ১২ ঘণ্টা আগে ভিজিয়ে রাখতে হয়। ভিজা খৈল, ফিশমিল, কুঁড়া এবং আটা একত্রে মিশিয়ে ছোট ছোট বলের মতো বানিয়ে পুকুরে দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় মোট খাবার দুইভাগে ভাগ করে এক ভাগ সকালে অন্য ভাগ বিকালে দিতে হয়। প্রতিদিন একই সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় খাদ্য দিতে হয়। এতে মাছের খাদ্য গ্রহণে সুবিধা হয়।বড় মাছ ও পোনা মাছের জন্য সম্পূরক খাদ্যের তালিকায় ব্যবহৃত উপাদান ও পরিমাণ ছক আকারে দেখানো হলো।

কার্প জাতীয় মাছের জন্য সম্পূরক খাদ্যের তালিকা

উপাদান	বড় মাছ	পোনা মাছ
ফিশমিল	১০ কেজি	২১ কেজি
চালের কুঁড়া	৫৩ কেজি	২৮ কেজি
সরিষার খৈল	৩০ কেজি	৪৫ কেজি
আটা	৬ কেজি	৫ কেজি
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	১ কেজি	১ কেজি
মোট	১০০ কেজি	১০০ কেজি

চিংড়ির জন্য সম্পূরক খাদ্যের তালিকা

উপাদান	পরিমাণ
চালের কুঁড়া বা গমের ভুসি	৫০০ গ্রাম
সরিষার খৈল	১৫০ গ্রাম
শুঁটকির গুঁড়া/ফিশমিল	২৫০ গ্রাম
শামুক–ঝিনুকের খোলসের গুঁড়া	৯৫ গ্রাম
লবণ	৩ গ্রাম
ভিটামিন মিশ্রণ	২ গ্রাম
মোট	১০০০ গ্রাম

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে দলীয়ভাবে চিংড়ি চাষের জন্য ১০ কেজি সম্পূরক খাদ্যের ১টি তালিকা পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করতে বলবেন।

পাঠ–৭ : পশুর সম্পূরক খাদ্য

আমাদের দেশে খড়, ভুসি, কুঁড়া, চাল, গম, খৈল, গাছের পাতা, ঘাস, আগাছা ইত্যাদি পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এগুলো সুষমভাবে খাওয়ানো হয় না এজন্য গবাদিপশু থেকে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া যায় না। তাই গবাদিপশুকে সম্পূরক খাদ্য দেওয়া হয়। শর্করা, আমিষ, চর্বি, খনিজ পদার্থ ও পানি এ ৬টি উপাদান বিবেচনায় রেখে সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা হয়। আমাদের দেশে জন্মায় এমন কিছু ঘাস যেমন- ইপিল ইপিল, নেপিয়ার, পারা, জার্মান, গিনি ইত্যাদি এবং খেসারি, কাউপি, মাষকলাই, ভুট্টা প্রভৃতি পশুকে খাওয়ানো হয়। প্রতিটি গাভীকে নিম্নোক্ত হারে দৈনিক সুষম খাদ্য খাওয়াতে হবে-

উপাদান	পরিমাণ
সবুজ কাঁচা ঘাস	১৫–২০ কেজি
শুকনা খড়	৩–৫ কেজি
দানাদার খাদ্য মিশ্রণ	২–৩ কেজি
লবণ	৫৫–৬০ গ্রাম

দানাদার খাদ্যের ক্ষেত্রে প্রথম ৩ লিটার দুধের জন্য ২ কেজি দানাদার খাদ্য দিতে হবে। পরবর্তী প্রতি ৩ লিটার দুধের জন্য ১ কেজি অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য দিতে হবে। যদি গরুকে শুধু সবুজ ঘাস ও খড় খাওয়ানো হয় তবে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩ কেজি ঘাস এবং ১ কেজি খড় দিতে হবে। আবার শুধু ঘাস খাওয়ালে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৬ কেজি ঘাস দিতে হবে। শুধু খড় খাওয়ালে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩ কেজি খড় দিতে হবে।

সম্পূরক খাদ্য হিসেবে দানাদার খাদ্য মিশ্রণ–

উপাদান	পরিমাণ
চালের কুঁড়া	২ কেজি
গমের ভুসি	৫ কেজি
ভুট্টা ভাঙা	১.৮ কেজি
তিল বা বাদামের খৈল	১ কেজি
লবণ	১০০ গ্রাম
খনিজ মিশ্রণ	১০০ গ্রাম
মোট	১০ কেজি

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে দলীয়ভাবে ২ কেজি দানাদার খাদ্য তৈরি করার কৌশল পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করতে বলবেন।

পাঠ–৮ : মুরগির সম্পূরক খাদ্য

বাংলাদেশে গ্রামীণ পরিবেশে ছাড়া অবস্থায় যেসব হাঁসমুরগি পালা হয় সেগুলো নিজেরা যতটুকু সম্ভব খাবার খায় এবং এদেরকে শুধু চালের কুঁড়া সরবরাহ করা হয়। এতে হাঁস–মুরগি পুষ্টিহীনতায় ভোগে। এছাড়া খামারে খাবার উপযুক্ত মাত্রায় সরবরাহ না করলেও হাঁস–মুরগি পুষ্টিহীনতায় ভোগে। ফলে হাঁস–মুরগি থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলন যেমন– ডিম, মাংস পাওয়া যায় না। এজন্য এদেরকে ৬টি পুষ্টি উপাদান (শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ, পানি) সমৃদ্ধ খাবার হিসেবে সরবরাহ করা হয়। এটাই হাঁস–মুরগির সম্পূরক খাদ্য। সম্পূরক খাদ্যে দানা জাতীয় ও আঁশ জাতীয় খাদ্য রাখতে হয়। নিচে বাড়ন্ত মুরগির সম্পূরক খাদ্যের তালিকা দেখানো হলো :

৮–১৬ সপ্তাহ বয়সের বাড়ন্ত মুরগির জন্য সম্পূরক খাদ্যের তালিকা

উপাদান	পরিমাণ
গম ভাঙা	৫০ ভাগ
গমের ভুসি	১০ ভাগ
চালের কুঁড়া	১৬ ভাগ
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	৯ ভাগ
তিলের খৈল	১২ ভাগ
ঝিনুকের গুঁড়া	২.৫ ভাগ
লবণ	০.৫ ভাগ
মোট	১০০ ভাগ

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে দলীয়ভাবে বাড়ন্ত মুরগির জন্য ১ কেজি সম্পূরক খাদ্য তৈরি, খাদ্য উপকরণ ও পরিমাণসহ একটি পোস্টার তৈরি করতে বলবেন।

পাঠ–৯ : জৈব সার

আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে সারের প্রকারভেদ ও বিভিন্ন জৈব সার সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা জৈব সার তৈরি ও তার ব্যবহার সম্পর্কে জানব। জৈব সার ব্যবহারে-

(১) মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।(২) মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাগুণের উন্নতি হয়।(৩) মাটিস্থ অণুজীবের কার্যাবলি বৃদ্ধি পায়।(৪) মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।(৫) মাটি থেকে পুষ্টির অপচয় কম হয়। (৬) মাটির উর্বরতা বাড়ে। (৭) মাটির সংযুক্তির উন্নতি হয়। (৮) ফসলের উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধি পায়।(৯) মাটির পরিবেশ উন্নত হয়।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে 'জৈব সার ব্যবহারের উপকারিতা' বিষয়ে শ্রেণিতে লিখতে দিবেন এবং দলগতভাবে তা উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করবেন।

এবার আমরা জৈব সার হিসেবে কম্পোস্ট সার, সবুজ সার ও খৈল তৈরি নিয়ে আলোচনা করব।

কম্পোস্ট তৈরি : গবাদিপশুর মলমূত্র, খাবারের উচ্ছিষ্ট, খড়কুটা, বিভিন্ন প্রকার কৃষিবর্জ্য, আগাছা, কচুরিপানা প্রভৃতি খামার প্রাঙ্গণে স্তরে স্তরে সাজিয়ে অণুজীবের সাহায্যে পচিয়ে যে সার তৈরি করা হয়, তাকে কম্পোস্ট সার বলা হয়। কাজেই অনেকগুলো জিনিস একত্রে পচিয়ে বা কখনো কখনো একটিমাত্র উপাদান দ্বারাও কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। দুটি পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। যথা– স্তূপ পদ্ধতি ও পরিখা পদ্ধতি।

এখানে আমরা পরিখা পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার তৈরি সম্পর্কে জানব।

পরিখা পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি : পরিখা পদ্ধতিতে সারা বছর কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। এ পদ্ধতিতে সার তৈরির নিয়মাবলি–

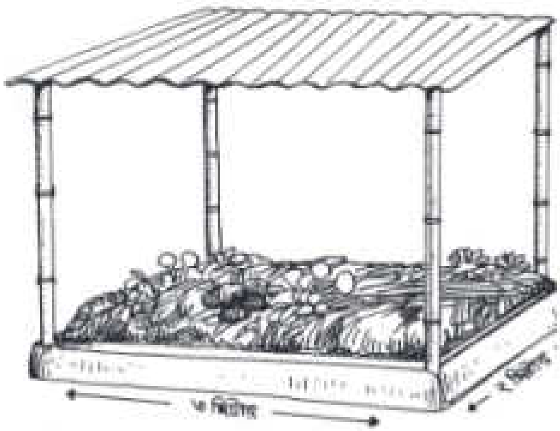

চিত্র–৩.২ পরিখা পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি

১. (ক) প্রথমে একটি উঁচু স্থান নির্বাচন করতে হবে (খ) নির্বাচিত স্থানে ৩ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২ মিটার প্রস্থ ও ১.২ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট পরিখা খনন করতে হবে (গ) এভাবে ৬টি পরিখা পাশাপাশি খনন করতে হবে (ঘ) পরিখার উপর চালার ব্যবস্থা করতে হবে (ঙ) পাঁচটি পরিখা আবর্জনা, খড়কুটা, লতাপাতা, গোবর দিয়ে পর্যায়ক্রমে স্তূপাকারে সাজাতে হবে এবং একটি পরিখা খালি থাকবে (চ) প্রতিটি পরিখার আবর্জনার স্তূপ ভূপৃষ্ঠ হতে ৩০ সেমি উঁচু হবে (ছ) চার সপ্তাহ পর নিকটবর্তী পরিখার কম্পোস্ট খালি পরিখায় স্থানান্তর করতে হবে (জ) এভাবে কম্পোস্টের উপাদানগুলো ওলটপালট করতে হবে। ফলে উপাদানগুলোর পচনক্রিয়াও ত্বরান্বিত হবে।

২. ২–৩ মাসের মধ্যে উপাদানগুলো সম্পূর্ণ পচে কম্পোস্ট তৈরি হবে।

কম্পোস্ট সারের উপকারিতা : কম্পোস্ট সার ব্যবহারে–

(১) মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায় (২) মাটিতে পুষ্টি উপাদান যুক্ত হয় (৩) মাটিস্থ পুষ্টি উপাদান সংরক্ষিত হয় (৪) মাটির সংযুক্তির উন্নয়ন ঘটে (৫) মাটির পানি ধারণক্ষমতা ও বায়ু চলাচল বাড়ে (৬) মাটিস্থ অণুজীবগুলো ক্রিয়াশীল হয়।

পাঠ–১০ : সবুজ সার তৈরি

জমিতে যেকোনো সবুজ উদ্ভিদ জন্মিয়ে কচি অবস্থায় চাষ করে মাটিতে মিশিয়ে যে সার প্রস্তুত করা হয় তাকে সবুজ সার বলে। ধইঞ্চা, গোমটর, বরবটি, শন, কলাই এসব ফসল দ্বারা এ সার তৈরি করা যায়।

১. প্রথমে এসব ফসলের যেকোনো একটি জমিতে চাষ করতে হবে। ফুল আসার আগে তা মই দিয়ে মাটির সাথে মেশাতে হবে।

২. তারপর আরও ৩–৪ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ওলটপালট করে মাটির সাথে ভালোভাবে মেশালে ২ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ পচে যায়।

৩. সবুজ সার যেখানে তৈরি হয় সেখানেই ব্যবহৃত হয়।

সবুজ সার হিসেবে ধইঞ্চা চাষ ও সার প্রস্তুতি

১. যেকোনো জমিতে ২/৩ টি চাষ দিতে হবে।

২. চাষকৃত জমিতে প্রতি শতকে ৭০ গ্রাম ফসফেট ও ৫০ গ্রাম পটাশ ছিটাতে হবে।

৩. তারপর প্রতি শতকে ২০০ গ্রাম করে ধইঞ্চা বীজ বপন করতে হবে।

৪. বীজ বপনের প্রায় আড়াই মাসের মধ্যে গাছে ফুল আসা শুরু করবে।

চিত্র-৩.৩ : ধইঞ্চা চাষ

৫. এ সময় লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ দিয়ে গাছগুলো মাটির নিচে ফেলতে হবে। গাছ লম্বা হলে কাস্তে বা দা দিয়ে কেটে ছোট করে জমি চাষ করতে হবে।

সবুজ সারের উপকারিতা : সবুজ সার ব্যবহারে–

১. মাটির উর্বরতা বাড়ে।

২. মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ যোগ হয়।

৩. মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৪. মাটিস্থ অণুজীবের কার্যাবলি বৃদ্ধি পায়।

৫. মাটিস্থ পুষ্টি উপাদান সংরক্ষিত হয়।

৬. মাটির জৈবিক পরিবেশ উন্নত হয়।

খৈল তৈরি : তেল বীজ হতে তেল বের করে নেওয়ার পর যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে খৈল বলে। সার ও গোখাদ্য হিসেবে খৈল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন রকম তেলবীজ থেকে বিভিন্ন রকমের খৈল পাওয়া যায়। যেমন– তুলা বীজের খৈল, সরিষার খৈল, বাদামের খৈল, তিলের খৈল, নিমের খৈল, তিসির খৈল ইত্যাদি। এ ধরনের সারে নাইট্রোজেন বেশি থাকে। এ সার ভালোভাবে গুঁড়া করে জমিতে ব্যবহার করতে হয়।

কাজ–১ : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কিছু পরিমাণ কম্পোস্ট সার নিয়ে আসবেন। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে উক্ত সারগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাগান বা টবে তাদের দ্বারা প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োগের নিয়মাবলি শিখিয়ে দিবেন।
কাজ–২ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে পরিখা পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরির চিহ্নিত চিত্র ও কম্পোস্ট সারের ব্যবহার সম্পর্কিত একটি পোস্টার তৈরি করতে বলবেন। শিক্ষক সেগুলো মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ–১১ : জৈব ও অরাসায়নিক বালাইনাশকের পরিচিতি

রাসায়নিক বালাইনাশককে বলা হয় নীরব ঘাতক। বালাইনাশক তিন প্রকার-জৈব, অরাসায়নিক এবং রাসায়নিক। রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগে পরিবেশের চরম ক্ষতি হচ্ছে। এ ক্ষতি কোনোভাবেই পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। রাসায়নিক বালাইনাশক মাত্রই বিষ। বিষ প্রয়োগে যেসব ফসল উৎপাদিত হয় তাও বিষমুক্ত নয়। বিষ শব্দটা যেমন আতঙ্কের তেমনি তার ভয়াবহতাও মারাত্মক। কাজেই পরিবেশকে বাঁচাতে এবং বিষমুক্ত ফসল ফলানোর জন্য জৈব ও অরাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার করা উচিত। যেসব বালাইনাশক বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের রস/নির্যাস, প্রাণিজ উপজাত এবং বিভিন্ন জৈবিক কলাকৌশল থেকে তৈরি করা হয় তাদেরকে জৈব ও অরাসায়নিক বালাইনাশক বলে। এসো আমরা জৈব ও অরাসায়নিক বালাইনাশক সম্পর্কে জানি।

(ক) জৈব বালাইনাশক

১. অ্যালামান্ডা গাছের নির্যাস ছত্রাকনাশক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
২. রসুনের নির্যাস ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ানাশক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
৩. নিমের নির্যাস (বাকল, পাতা, ফুল ও ফল) জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। শুকনা নিমপাতার গুঁড়া বীজ ফসল/গুদামজাত শস্যের সাথে মিশ্রিত করে কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। নিমের তেল ও খৈল ফসলের মূলের কৃমিনাশক। যেমন : নিমবিসিডিন।
৪. তামাক পাতার নির্যাস 'নিকোটিন সালফেট' ব্যবহার করে ফসলের কান্ড বা পাতায় কীটপতঙ্গের আক্রমণ রোধ করা যায়।
৫. মুরগির পচনকৃত বিষ্ঠা ও সরিষার খৈল ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সবজি ফসলের মাটিবাহিত রোগ দমন করা যায়।
৬. সুগারবিটের শিকড় থেকে আহরিত লাইমো ব্যাকটেরিয়া প্রজাতি উদ্ভিদের মাটিবাহিত 'ড্যাম্পিং অফ' রোগ দমনে একটি কার্যকরি ব্যাকটেরিয়াম। এটি পোষক উদ্ভিদ, যেমন– পালংশাক ও সুগারবিটের শিকড়াঞ্চলে যুক্ত হয়ে কলোনি তৈরি করে এবং জীবাণুনাশক এন্টিবায়োটিক নিঃসরণের মাধ্যমে উদ্ভিদ রোগ দমন করে থাকে।

৭. ট্রাইকোডারমা জাতীয় প্রজাতি ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৮. বিভিন্ন ধরনের জীবাণু সার প্রয়োগ করে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

(খ) **অরাসায়নিক বালাইনাশক**

১. ধানের পাতার লালচে রেখা রোগমুক্ত করতে হলে ধানের বীজ ৫৪° সে. তাপমাত্রায় ১৫ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রেখে ব্যাকটেরিয়া জনিত বীজবাহিত এ রোগ দূর করা যায়।
২. জাব পোকা দমনে লেডিবার্ড বিটল পোকা ডাল ও তেল জাতীয় ফসলে বৃদ্ধি করা যায়।
৩. ফসলের ক্ষতিকর পোকা দমনে প্রেইং ম্যানটিড এর সংখ্যা বাড়ানো যায়।
৪. ডালিম ফলের চারদিকে পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলে ডালিমকে পোকা আক্রমণ করতে পারে না।
৫. জমিতে সুষম সার ব্যবহার করলে পোকামাকড় ও রোগজীবাণু অনেক কম হয়।
৬. পোকার আশ্রয়স্থল হলো আগাছা। কাজেই জমি থেকে সবসময় আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে।
৭. আলোর ফাঁদ পেতে পূর্ণ বয়স্ক পোকা মেরে ফেলা যায়।
৮. হাতজাল ব্যবহার করে পোকা ধরে ফেলা যায়।
৯. জমিতে গাছের ডাল বা বাঁশের কঞ্চি পুঁতে পাখি বসিয়ে পোকা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
১০. ধান ক্ষেতে মাছের চাষ করা যায়।
১১. ফসল সংগ্রহের পর নাড়া পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
১২. কলম চারা ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুন ও টমেটোর ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট রোগ দমন করা যায়।
১৩. ফেরোমোন ও মিষ্টি কুমড়ার ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে কুমড়া জাতীয় ফসলের মাছি পোকা দমন করা যায়।
১৪. মেহগনি ফল থেকে সংগৃহীত নির্যাস ও তেল ভেষজ কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার ও প্রয়োগ করা হয়।
১৫. পরভোজী পোকা যেমন– নেকড়ে মাকড়সা, ঘাসফড়িং, ড্যামসেল মাছি, মিরিডবাগ ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
১৬. জমিতে ব্যাঙের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে দলীয়ভাবে রাসায়নিক ও অরাসায়নিক বালাইনাশকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখতে বলবেন।

পাঠ–১২ : কৃষিতে রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারের কুফল

ব্যাপকভাবে রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারের কারণে কৃষিতে সুবিধার চেয়ে অসুবিধা বেশি হয়। কৃষিতে এর অসুবিধা বা ক্ষতিকর দিকগুলো হলো–

১. দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে শস্য ক্ষেতে বালাই বা কীটপতঙ্গ বালাইনাশককে বাধাদানের ক্ষমতা অর্জন করে। ফলে ঐ বালাইনাশক দিয়ে আর নির্দিষ্ট কীট বা বালাইকে ধ্বংস করা যায় না।

২. অধিকাংশ কীটনাশক প্রাকৃতিক শিকারি জীব ও মৃত্তিকার উপকারী অণুজীবগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে।

৩. শস্য ক্ষেতে প্রয়োগকৃত কীটনাশক ও বালাইনাশকের খুব সামান্য অংশ (১% বা এর কাছাকাছি) কাঙ্ক্ষিত কীট বা বালাইয়ের কাছে পৌঁছাতে পারে।

৪. প্রয়োগকৃত রাসায়নিক বালাইনাশকের একটি বড় অংশ বাতাসে, ভূপৃষ্ঠের পানিতে, ভূগর্ভস্থ পানিতে অনুপ্রবেশ করে এবং জীবের খাদ্যচক্রে ঢুকে পড়ে।

৫. বালাইনাশক মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার মাধ্যমে মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস করে।

৬. রাসায়নিক বালাইনাশক জীববৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে।

৭. রাসায়নিক বালাইনাশক সার্বিকভাবে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে।

কাজ–১ : সম্ভব হলে শিক্ষক কীটপতঙ্গ দমনে খাদক পোকামাকড় ব্যবহার, হরমোন ফাঁদ, আলোর ফাঁদ ও রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহার ভিডিও/ছবি/পোস্টার নমুনার সাহায্যে দেখাবেন।

কাজ–২ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এককভাবে 'রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারের কুফল' বিষয়ে পোস্টার পেপার অঙ্কন করতে বলবেন অথবা লিখতে বলবেন।

অথবা

কাজ–১ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অপকারী বা ক্ষতিকর পোকাখাদক পাখি ও পোকার নামের একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন। এ কাজটি শিক্ষক দলীয়ভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করবেন।

কাজ–২ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে জৈব ও অরাসায়নিক বালাইনাশক সংগ্রহ করে জমা দিতে বলবেন।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানগুলোকে .... শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

২. .... উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

৩. গৃহপালিত পশু খাদ্যে .... পুষ্টি উপাদান থাকা দরকার।

৪. .... পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি করা যায়।

মিলকরণ

	বামপাশ	ডানপাশ
১.	ডাল, খৈল, শুঁটকি গুঁড়া	আঁশ জাতীয় পুষ্টি উপাদান
২.	নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম	কৃত্রিম উৎস
৩.	জৈব ও রাসায়নিক সার	পুষ্টি উপাদান
৪.	কাঁচা ঘাস, মুলা, গাজর	আমিষ
		শর্করা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান বলতে কী বোঝ?

২. উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের উৎস কয়টি ও কী কী?

৩. সম্পূরক খাদ্য বলতে কী বোঝ?

৪. সবুজ সার কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সবুজ সারের উপকারিতা বর্ণনা কর।

২. বালাইনাশক বলতে কী বোঝ? বিভিন্ন প্রকার বালাইনাশকের বর্ণনা দাও।

৩. কৃষিতে রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক উল্লেখ কর।

৪. উদ্ভিদের জীবনচক্রে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের ভূমিকা বর্ণনা কর।

৫. কম্পোস্ট সার বলতে কী বোঝ? কম্পোস্ট সার তৈরির পরিখা পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান কয়টি?

ক. ১১ খ. ১৪
গ. ১৭ ঘ. ২০

২. উদ্ভিদে কার্বন ও হাইড্রোজেন ঘাটতি পূরণে প্রয়োজন–

i. পানি
ii. মাটি
iii. বায়ু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সালমা নতুন মুরগি চাষি, সে ডিম উৎপাদনের জন্য বাজার থেকে ১৮ টি মুরগি ও ৬ কেজি মুরগির খাদ্য কিনে আনে।কিন্তু দু'দিন পর সে লক্ষ করল মুরগির ডিমের খোসাগুলো বেশ নরম প্রকৃতির, ফলে সে বিচলিত হয়ে পড়ে।

৩. ন্যূনতম হারে খাদ্য খাওয়ালে সালমা ক্রয়কৃত খাদ্য মুরগিগুলোকে কয়দিন খাওয়াতে পারবে?

ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪

৪. সালমার মুরগির ডিম উৎপাদনে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য খাদ্যে যোগ করতে হবে–

ক. খৈল খ. ডাল চূর্ণ
গ. ভুট্টা ভাঙা ঘ. লবণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সরদারপাড়া গ্রামের কৃষক হাফিজ ২০ শতাংশ জমি বর্গা নিয়ে ধান চাষ শুরু করে লক্ষ করলেন ধান চারার কুশি আশানুরূপ হারে গজাচ্ছে না এবং জমিতে পোকামাকড় দেখা যাচ্ছে। চিন্তিত হাফিজকে বিভিন্নজন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগের পরামর্শ দিলেও তিনি সেটি গ্রহণ করেননি। ফলে প্রথম দফায় সে সফল না হলেও পরের বছর জৈব ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে তিনি ঐ জমি থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করেন।

ক. উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বলতে কী বোঝ?

খ. পরিখা পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরির ক্ষেত্রে একটি পরিখা ফাঁকা রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রথম দফায় কী ধরনের জৈব ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করলে হাফিজ উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারতেন তা বর্ণনা কর।

ঘ. হাফিজের দ্বিতীয় বারের চাষ ব্যবস্থাপনা শুধু পুষ্টি ঘাটতি পূরণই নয় রোগবালাই দমনেও সহায়ক ভূমিকা রেখেছে– মূল্যায়ন কর।

২. আহাদ সাহেব দ্বিতীয় বারের মতো বাড়ির পাশের পতিত জমিটি চাষের জন্য ঠিক করে বেগুনের চারা রোপণ করলেন। চারাগুলো বড় হলে ফুল ও ফল আসে। কিন্তু এক সময় জমির অধিকাংশ বেগুন গাছের কাণ্ডে ও ডগায় বিভিন্ন রকমের পোকার উপস্থিতি দেখা যায় আর কিছু কিছু বেগুনে ছোট কালো ছিদ্র লক্ষ করা যায়। গত বছর এই একই পরিস্থিতিতে তিনি কীটনাশক প্রয়োগ করেছিলেন কিন্তু কোনো উপকার পাননি বরং অর্থের অপচয় হয়েছে। তাই এবার তিনি বিকল্প উপায় খুঁজতে কৃষি কর্মকর্তার সঙ্গে পরামর্শ করেন।

ক. পরিবেশকে বাঁচাতে কী ধরনের বালাইনাশক ব্যবহার করতে হয়?

খ. কী কারণে বালাইনাশককে নীরব ঘাতক বলা হয় ব্যাখ্যা কর।

গ. আহাদ সাহেবের সবজি ক্ষেতের সমস্যা দূরীকরণের উপায় বর্ণনা কর।

ঘ. প্রথম বার সবজি ক্ষেতে আহাদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলাফল মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষি ও জলবায়ু

এ অধ্যায়ে প্রথমে কৃষি মৌসুম, কৃষি মৌসুমের বৈশিষ্ট্য, রবি, খরিপ ও মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল এবং এসব ফসলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরে ফসল উৎপাদনে আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিকূল আবহাওয়া ও জলবায়ু যেমন– অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এসব প্রতিকূল পরিবেশে ফসলের কী কী ধরনের ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

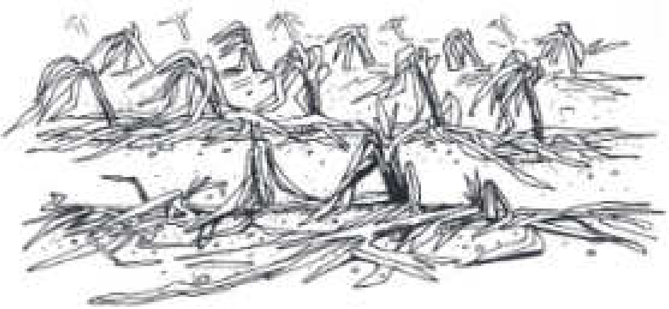

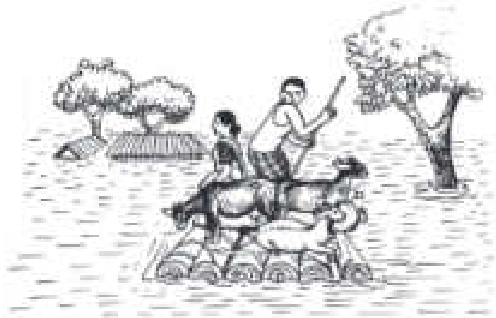

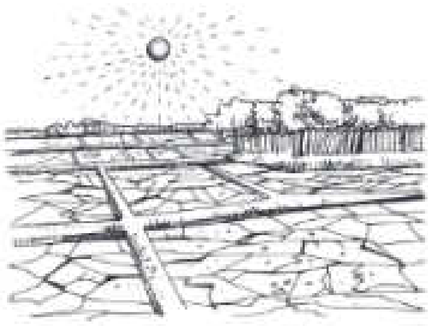

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- কৃষি মৌসুমের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব ;
- রবি ও খরিপ মৌসুমের ফসলাদি শনাক্ত করতে পারব ;
- মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলাদি শনাক্ত করতে পারব ;
- কৃষি উৎপাদনে আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- কৃষি উৎপাদন ও কৃষি পরিবেশ বিবেচনায় বাংলাদেশকে প্রধান কয়েকটি অঞ্চলে চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ –১ : কৃষি মৌসুম

ষষ্ঠ শ্রেণির চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা ফসল উৎপাদনে আবহাওয়া ও জলবায়ুর গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছি। কোন অঞ্চলে কখন কোন ফসল জন্মাবে তা নির্ভর করে সে অঞ্চলের জলবায়ুর উপর। তাই কোনো অঞ্চল বা দেশের ফসল উৎপাদনের ধরন ও সময় জানতে হলে সে অঞ্চল বা দেশের জলবায়ুকে জানতে হবে। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, সূর্যালোক, বায়ুচাপ, বায়ুর আর্দ্রতা ইত্যাদি হলো আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান। এ উপাদানগুলোই ফসল উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ও দূরত্ব, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জলবায়ু সাধারণত সমভাবাপন্ন। পরিমিত বৃষ্টিপাত, মধ্যম শীতকাল, আর্দ্র গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের জলবায়ু কৃষি উৎপাদনের জন্য খুবই সহায়ক।

একটি ফসল বীজ বপন থেকে শুরু করে তার শারীরিক বৃদ্ধি ও ফুল–ফল উৎপাদনের জন্য যে সময় নেয় তাকে ঐ ফসলের মৌসুম বলে। অর্থাৎ কোনো ফসলের বীজ বপন থেকে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত সময়কে সে ফসলের মৌসুম বলে। বাংলাদেশের জলবায়ুর উপর নির্ভর করে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ফসল জন্মে। ফসল উৎপাদনের জন্য সারা বছরকে প্রধানত দুটি মৌসুমে ভাগ করা হয়েছে; যথা–

ক. রবি মৌসুম

খ. খরিপ মৌসুম

ক. রবি মৌসুম : আশ্বিন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সময়কে রবি মৌসুম বলে। রবি মৌসুমের প্রথম দিকে কিছু বৃষ্টিপাত হয়, তবে তা খুবই কম হয়ে থাকে। এ মৌসুমে তাপমাত্রা, বায়ুর আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত সবই কম হয়ে থাকে।

খ. খরিপ মৌসুম : চৈত্র থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সময়কে খরিপ মৌসুম বলে। খরিপ মৌসুমকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা– খরিপ–১ বা গ্রীষ্মকাল এবং খরিপ–২ বা বর্ষাকাল।

খরিপ–১ : চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত সময়কে খরিপ–১ মৌসুম বা গ্রীষ্মকাল বলা হয়। এ মৌসুমে তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং মাঝে মাঝে ঝড়, বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে।

খরিপ–২ : আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সময়কে খরিপ–২ মৌসুম বা বর্ষাকাল বলা হয়। এ সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে এবং তাপমাত্রা মাঝারি মাত্রার হয়।

যে সকল ফসলের বৃদ্ধি ও ফুল-ফল উৎপাদন তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুর আর্দ্রতা, দিনের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় কেবল সে সকল ফসলেরই মৌসুমভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ করা হয়। বহু বর্ষজীবী ফসল যেমন-ফলদ, বনজ ও ঔষধি ফসলের ক্ষেত্রে মৌসুমভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ তেমন প্রযোজ্য নয়।

চিত্র-৪.১ : কৃষি মৌসুম

কাজ : শিক্ষার্থীরা এককভাবে কৃষি মৌসুমের বৈশিষ্ট্যগুলো খাতায় লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : কৃষি মৌসুম, রবি মৌসুম, খরিপ-১, খরিপ-২

পাঠ-২: রবি মৌসুমের ফসল

রবি ফসল: যেসব ফসলের শারীরিক বৃদ্ধি ও ফুল-ফল উৎপাদনের পুরো বা অধিক সময় রবি মৌসুমে হয় তাদেরকে রবি ফসল বলে। রবি ফসলকে শীতকালীন ফসলও বলা হয়ে থাকে। রবি ফসলের বৈশিষ্ট্য জানতে হলে আমাদের রবি মৌসুমের বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে জানতে হবে। রবি মৌসুমের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

১. তাপমাত্রা কম থাকে।

২. বৃষ্টিপাত কম হয়।

৩. বায়ুর আর্দ্রতা কম থাকে।

চিত্র-৪.২ : খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ

৪. ঝড়ের আশঙ্কা কম থাকে।

৫. শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা কম থাকে।

৬. বন্যার আশঙ্কা কম থাকে।

৭. রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।

৮. পানিসেচের প্রয়োজন হয়।

৯. দিনের চেয়ে রাত বড় বা সমান হয় ।

রবি মৌসুমের বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, এ মৌসুমে কোন ধরনের ফসল জন্মায়। যেসব ফসল চাষাবাদের জন্য কম তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় সেসব ফসল রবি মৌসুমে চাষাবাদ করা হয়। রবি মৌসুমে আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, গাজর, লাউ, শিম, ওলকপি, ব্রোকলি, শালগম, পালংশাক, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি উদ্যান ফসল চাষ করা হয়। মাঠ ফসলের মধ্যে রয়েছে বোরো ধান, গম, সরিষা, তিসি, মসুর, ছোলা, খেসারি ইত্যাদি। এ মৌসুমে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হয়।

চিত্র-৪.৩: বিভিন্ন প্রকার রবি ফসল

নতুন শব্দ : রবি ফসল, রবি ফসলের বৈশিষ্ট্য, রবি মৌসুমের বৈশিষ্ট্য

পাঠ– ৩ : খরিপ মৌসুমের ফসল

যেসব ফসলের শারীরিক বৃদ্ধি ও ফুল–ফল উৎপাদনের পুরো বা অধিক সময় খরিপ মৌসুমে হয় তাদেরকে খরিপ ফসল বলে। খরিপ ফসলের বৈশিষ্ট্য জানতে হলে আমাদের খরিপ মৌসুমের বৈশিষ্ট্য জানতে হবে। খরিপ মৌসুমের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

১. এ মৌসুমে তাপমাত্রা বেশি থাকে।

২. বৃষ্টিপাত বেশি হয়।

৩. বায়ুর আর্দ্রতা বেশি থাকে।

৪. ঝড়ের আশঙ্কা বেশি থাকে।

৫. শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা বেশি থাকে।

৬. বন্যার আশঙ্কা বেশি থাকে।

৭. রোগ ও পোকার আক্রমণ বেশি হয়।

৮. পানি সেচের তেমন প্রয়োজন হয় না।

৯. দিনের দৈর্ঘ্য রাতের দৈর্ঘ্যের সমান বা বেশি হয়।

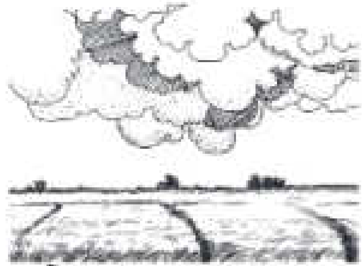

চিত্র-৪.৪ : মেঘলা আকাশ

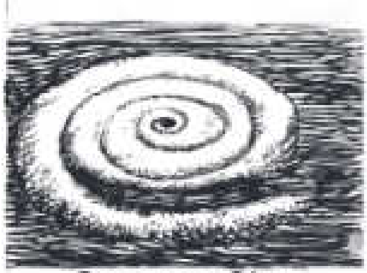

চিত্র-৪.৫ : ঘূর্ণিঝড়

যেসব ফসল চাষাবাদের জন্য বেশি তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় সেসব ফসল খরিপ মৌসুমে চাষাবাদ করা হয়। খরিপ মৌসুমকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা–

খরিপ–১ : এ মৌসুমে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয় এবং মৌসুমের শেষের দিকে বেশি বৃষ্টিপাত শুরু হয়। কালবৈশাখী ঝড় ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা বেশি। এ মৌসুমে দেশের অনেক অঞ্চলে ঢল বন্যার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ সময় তাপমাত্রা খুব বেশি এবং বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ মাঝারি থাকে। ফসলে রোগ ও পোকার আক্রমণ মাঝারি হয়। ফসল উৎপাদনে মাঝারি ধরনের সেচের প্রয়োজন হয়। এ মৌসুমের প্রধান ফসল হলো– পাট, তিল, ডাঁটা, মুখি কচু, ঢেঁড়স, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, করলা, পটোল, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি। আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে, তরমুজ, বাঙ্গী এ সময়ে পাকে।

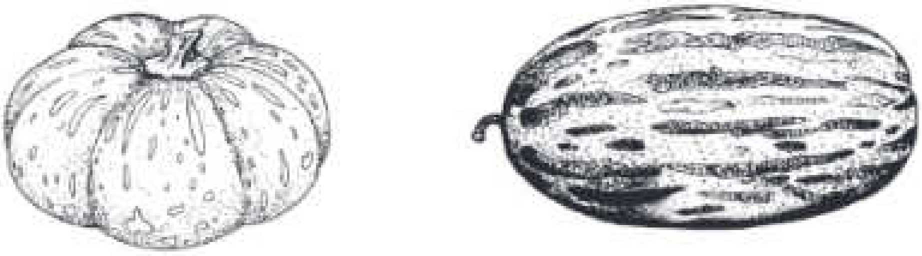

মিষ্টি কুমড়া তরমুজ

চিত্র–৪.৬: খরিপ–১ মৌসুমের ফসল

খরিপ–২ : এ মৌসুমে সাধারণত বৃষ্টিপাত খুব বেশি হয়। ঝড় ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা কম থাকে তবে বন্যার আশঙ্কা বেশি থাকে। তাপমাত্রা ও বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে। ফসলে পোকার আক্রমণ ও রোগ বেশি হয়। ফসল উৎপাদনে কৃত্রিম পানি সেচের প্রয়োজন তেমন হয় না। এ মৌসুমের প্রধান ফসল হলো– আমন ধান, পানি কচু, চাল কুমড়া, ঢেঁড়স, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দল ইত্যাদি। এ সময়ে তাল, আমলকী, আনারস, আমড়া, পেয়ারা, নাবি জাতের আম ও কাঁঠাল এবং বাতাবি লেবু পাকে।

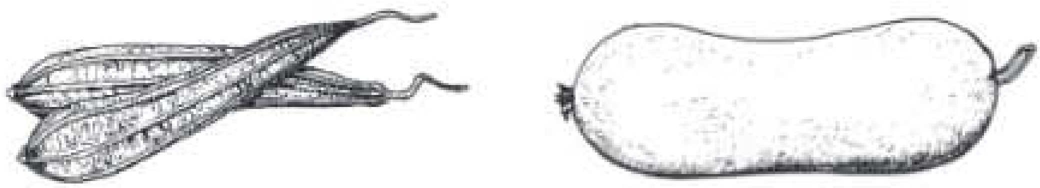

ঝিঙ্গা চাল কুমড়া

চিত্র–৪.৭: খরিপ–২ মৌসুমের ফসল

কাজ : ঋতু অনুযায়ী শস্যের/ফলের বিন্যাস কর।			
ফসলের/ফলের নাম	রবি	খরিপ–১	খরিপ–২
পাট, আমন ধান, আলু, তিল, ঢেঁড়স, ফুলকপি, কাঁঠাল, আনারস, পেঁয়াজ, তরমুজ, চালকুমড়া, সরিষা, মুখিকচু, তাল, মসুর			

নতুন শব্দ : খরিপ ফসল, খরিপ–১ এবং খরিপ–২ মৌসুমের বৈশিষ্ট্য

পাঠ–৪ : মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য জানতে পেরেছি। এসব মৌসুমি ফসলের ক্ষেত্রে এক মৌসুমের ফসল অন্য মৌসুমে চাষ করা যায় না। কিন্তু এমন কতগুলো ফসল রয়েছে যাদের সারা বছর লাভজনকভাবে চাষ করা যায়। তোমরা কি এ ধরনের কিছু ফসলের নাম বলতে পারবে?

যেসব ফসল সারা বছর লাভজনকভাবে চাষ করা হয় তাদেরকে মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল বা বারমাসি ফসল বলা হয়। মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলগুলোকে আবার দিবা নিরপেক্ষ ফসলও বলে। কারণ যেকোনো দৈর্ঘ্যের দিনে এসব ফসল ফুল–ফল উৎপাদন করতে পারে। ফসলের ফুল–ফল উৎপাদনে দিবা দৈর্ঘ্যের প্রভাবের বিষয়ে আমরা পরের পাঠে বিস্তারিত জানব। আমাদের দেশে মৌসুম নিরপেক্ষ উদ্যান ফসলগুলোর মধ্যে রয়েছে– লালশাক, বেগুন, মরিচ, পেঁপে, কলা ইত্যাদি। অন্যদিকে মৌসুম নিরপেক্ষ মাঠ ফসলগুলোর মধ্যে রয়েছে– ভুট্টা, চিনাবাদাম ইত্যাদি।

আমাদের দেশে আবহাওয়া ও জলবায়ুগত সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক ফসল সারা বছর চাষ করা যায় না। তবে কিছু উচ্চমূল্যের ফসল রয়েছে যা সারা বছর চাষ করা সম্ভব হলে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো না– যেমন টমেটো ও পেঁয়াজ। এ সমস্যা সমাধানের জন্য মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলের জাত নিয়ে গবেষণা চলছে। ইতোমধ্যে সারা বছর চাষোপযোগী টমেটো ও পেঁয়াজের অনেকগুলো জাত বের করা হয়েছে।

তোমাদের মনে কি এ প্রশ্ন জাগে না যে, কেন কিছু ফসল সারা বছর চাষ করা যায়? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের ফসলের জলবায়ুগত চাহিদার কথা ভাবতে হবে। আমরা জানি রবি ফসলের জন্য এক ধরনের এবং খরিপ ফসলের জন্য আরেক ধরনের জলবায়ুর প্রয়োজন। মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলগুলো রবি ও খরিপ উভয় মৌসুমেই জন্মাতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলগুলোর জলবায়ুগত চাহিদার বিস্তার অনেক বেশি হবে। ফলে এ ফসলগুলো উভয় মৌসুম বা সারা বছর চাষ করা যায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলগুলো–

১. কম তাপমাত্রা থেকে বেশি তাপমাত্রায় জন্মাতে পারে।
২. কম বৃষ্টিপাত থেকে বেশি বৃষ্টিপাতে জন্মাতে পারে।
৩. কম আর্দ্রতা থেকে বেশি আর্দ্রতায় জন্মাতে পারে।
৪. স্বল্প দিবা দৈর্ঘ্য থেকে দীর্ঘ দিবা দৈর্ঘ্যে ফুল–ফল উৎপাদন করতে পারে।

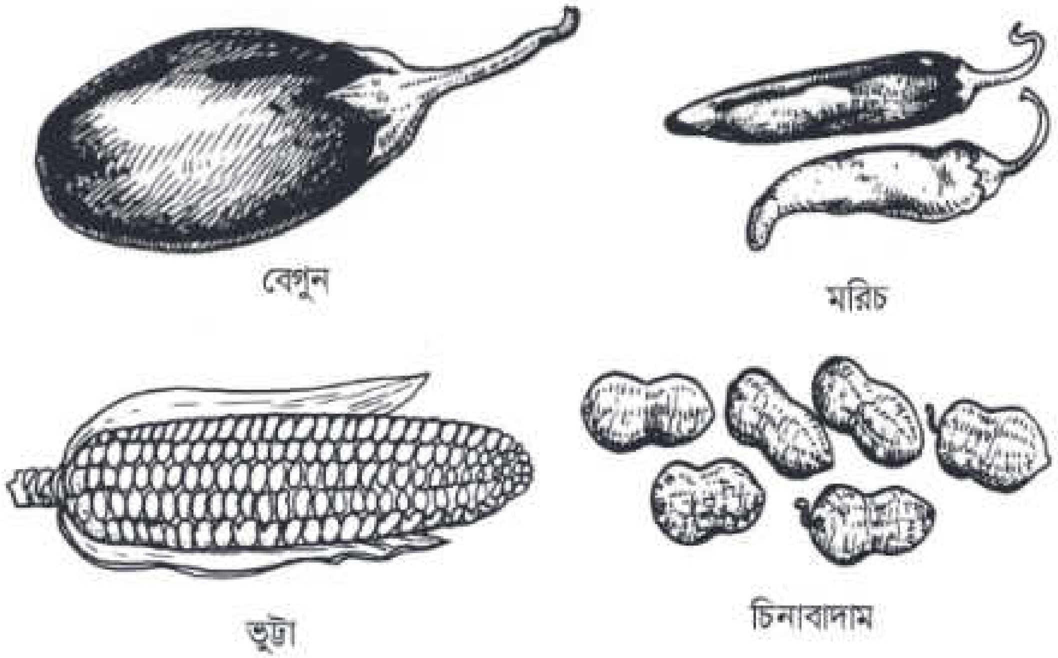

চিত্র–৪.৮: মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল

> **কাজ :** শিক্ষার্থীরা চারটি দলে ভাগ হয়ে যাও। এবার তোমাদের দেখানো মিশ্র ফসলের চার্ট থেকে মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলের একটি তালিকা তৈরি কর এবং উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল

পাঠ–৫ : ফসল উৎপাদনে আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব

কোন অঞ্চলে কী ধরনের ফসল জন্মাবে তা ঐ অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানগুলো ফসল উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে। এসব উপাদান কীভাবে ফসল উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে এখন আলোচনা করব।

১. সূর্যালোক : সূর্যালোক অনেকভাবে ফসল উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে। আমরা জানি উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। এ প্রক্রিয়ায় সূর্যালোকের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমন্বয়ে পাতায় খাদ্য তৈরি হয়। সূর্যালোকের প্রয়োজন অনুসারে উদ্ভিদকে প্রধানত দুই ভাগ করা হয়; যথা– ক) আলো পছন্দকারী উদ্ভিদ ও খ) ছায়া পছন্দকারী উদ্ভিদ। ভুট্টা, আখ পূর্ণ সূর্যালোকে ভালো জন্মে আবার চা, কফি ছায়া পছন্দ করে।

দৈনিক আলোর সংস্পর্শে আসার সময় দিনের দৈর্ঘ্য ফসলের ফুল–ফল উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে। দিনের দৈর্ঘ্যের উপর সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে উদ্ভিদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা–

ক) দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ বা বড় দিনের উদ্ভিদ : এসব উদ্ভিদের ফুল–ফল উৎপাদনের জন্য দিনের দৈর্ঘ্য ১২ ঘণ্টার বেশি প্রয়োজন হয়। যেমন– আউশ ধান, পাট, চালকুমড়া, চিচিঙ্গা, ধুন্দল ইত্যাদি।

খ) স্বল্প দিবা উদ্ভিদ বা ছোট দিনের উদ্ভিদ : এসব উদ্ভিদের ফুল–ফল উৎপাদনের জন্য দিনের দৈর্ঘ্য ১২ ঘণ্টার কম প্রয়োজন হয়। যেমন– গম, সরিষা, আমন ধান, গিমা, কলমি, পুঁইশাক ।

গ) দিবা নিরপেক্ষ উদ্ভিদ : যেকোনো দৈর্ঘ্যের দিনে এসব ফসলের ফুল–ফল উৎপাদিত হয়ে থাকে। যেমন– চিনাবাদাম, টমেটো, কার্পাস তুলা ইত্যাদি।

২. তাপমাত্রা : বেঁচে থাকার জন্য সকল উদ্ভিদে একটি সর্বনিম্ন, সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রয়েছে। একে কার্ডিনাল তাপমাত্রা বলে। কার্ডিনাল তাপমাত্রা উদ্ভিদের প্রজাতি ও জাত ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কোনো স্থানের ফসলের বিস্তৃতি কার্ডিনাল তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাপমাত্রার চাহিদা অনুযায়ী আবাদযোগ্য ফসলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা– ঠাণ্ডা ঋতুর ফসল ও উষ্ণ ঋতুর ফসল।

ক) ঠাণ্ডা ঋতুর ফসল : এরা অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রা পছন্দ করে; যেমন– গম, আলু, ছোলা, মসুর, ফুলকপি, ওলকপি ইত্যাদি। এদের জন্মানোর জন্যে সর্বনিম্ন ০°–৫° সে., সর্বোত্তম ২৫°–৩১° সে. এবং সর্বোচ্চ ৩১°–৩৭° সে. তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়।

খ) উষ্ণ ঋতুর ফসল : এ ফসলগুলো অপেক্ষাকৃত উচ্চতাপমাত্রায় জন্মে; যেমন–পাট, রাবার, কাসাভা। এদের জন্মানোর জন্য সর্বনিম্ন ১৫°–১৮° সে., সর্বোত্তম ৩১°–৩৭° সে. এবং সর্বোচ্চ ৪৪°–৫০° সে. তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়।

৩. বৃষ্টিপাত : উদ্ভিদের জন্য পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদ মাটিতে ধারণকৃত পানির উপর নির্ভরশীল। আর বৃষ্টিপাত মাটিতে ধারণকৃত পানির প্রধান উৎস। সেজন্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও সময় ফসল উৎপাদনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৃষ্টিপাতের পার্থক্যের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ফসল জন্মে থাকে।

৪. বায়ুপ্রবাহ : প্রস্বেদন, সালোকসংশ্লেষণ, ফুলের পরাগায়ন ইত্যাদি বায়ু প্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৫. বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ : ফসলের প্রাথমিক বৃদ্ধি পর্যায়ে উচ্চ জলীয়বাষ্প সহায়ক। দানা গঠন পর্যায়ে নিম্ন জলীয়বাষ্প দানার সংকোচন ঘটাতে পারে। বাতাসে অধিক জলীয়বাষ্পের পরিমাণ রোগজীবাণু ও পোকার বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করে।

৬. শিশিরপাত ও কুয়াশা : কোনো কোনো সময় শিশিরপাত ও কুয়াশা বায়ুর আর্দ্রতা বাড়িয়ে ফসলে রোগ বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা চারটি দলে ভাগ হয়ে ফসল উৎপাদনে প্রভাব বিস্তারকারী আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : স্বল্প দিবা উদ্ভিদ, দীর্ঘ দিবা উদ্ভিদ, দিবা নিরপেক্ষ উদ্ভিদ, আলো পছন্দকারী, ছায়া পছন্দকারী উদ্ভিদ, কার্ডিনাল তাপমাত্রা

পাঠ– ৬ : ফসল উৎপাদনে প্রতিকূল আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব

আবহাওয়া ও জলবায়ু অনুকূল থাকলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তবে প্রতিকূল আবহাওয়া ও জলবায়ুতে ফসল উৎপাদন হ্রাস পায়, এমনকি উৎপাদন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমরা এ পাঠে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করব। এ ধরনের আবহাওয়ায় ফসলের কী ধরনের ক্ষতি হয় সে সম্পর্কেও জানব।

১. অতিবৃষ্টি : স্বাভাবিকের তুলনায় যখন কোনো স্থানে বেশি বৃষ্টিপাত হয় তখন তাকে আমরা অতিবৃষ্টি বলি। অতিবৃষ্টির কারণে বর্ষাকালে শাকসবজির উৎপাদন ব্যাহত হয়। অতিবৃষ্টির কারণে শাকসবজির গাছ মাটিতে হেলে পড়ে পাতা, ফুল–ফল নষ্ট হয়ে যায়। অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা ও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে। বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মাটিতে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়। এ অবস্থায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি অনেক গাছ মারাও যায়; যেমন– কাঁঠাল, পেঁপে। এ জন্য অতিবৃষ্টির মাধ্যমে জমা পানি দ্রুত নিকাশের ব্যবস্থা করতে হয়।

২. শিলাবৃষ্টি : বৃষ্টিপাতের সাথে যখন বরফ খণ্ড পতিত হয় তখন তাকে শিলাবৃষ্টি বলে। বাংলাদেশে প্রতি বছর চৈত্র–বৈশাখ মাসে শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে। শিলাবৃষ্টির পরিমাণ দেশের উত্তরাঞ্চলের চেয়ে দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চলে বেশি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালবৈশাখীর সাথে শিলাবৃষ্টি হয়। শিলাবৃষ্টি ফসলের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। শিলার আঘাতে ফসলের পাতা, কচি ডাল, ফুল, ফল ভেঙে ঝরে পড়ে, থেঁতলে যায়। শিলাবৃষ্টির পরিমাণ বেশি হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফসল মাটির সাথে মিশে যেতে পারে। আমাদের দেশে বোরো ধান, পাট, আম, কলা, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি ফসল শিলাবৃষ্টির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

৩. খরা : দীর্ঘ দিন বৃষ্টিপাতহীন অবস্থাকে খরা বলে। আমাদের দেশে চৈত্র মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত সময়ে একটানা ২০ দিন বা তার বেশি দিন ধরে কোনো বৃষ্টিপাত না হলে তাকে খরা বলে। অনাবৃষ্টির কারণে মাটিতে ক্রমান্বয়ে রসের ঘাটতি দেখা দেয়। ফসল যে পরিমাণ পানি মাটি থেকে শোষণ করে তার চেয়ে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বেশি পানি ত্যাগ করে । এ অবস্থায় ফসলের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি অবস্থা বিরাজ করে। এ অবস্থাকে খরা কবলিত বলা হয়। খরার ফলে গাছ নেতিয়ে পড়ে, খরা তীব্র হলে গাছ শুকিয়ে মারা যায়। খরার ফলে ফসলের বৃদ্ধি ও বিকাশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে ফসলের ফলন কমে যায়। ফসলের ক্ষতির মাত্রার উপর নির্ভর করে খরাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা– তীব্র খরা, মাঝারি খরা এবং সাধারণ খরা। তীব্র খরায় ৭০–৯০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়। মাঝারি খরায় ৪০–৭০ ভাগ এবং সাধারণ খরায় ১৫–৪০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রায় সকল মৌসুমেই ফসল খরায় কবলিত হয়। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর এবং মধুপুর অঞ্চলে তীব্র থেকে মাঝারি খরা দেখা দেয়।

৪. বন্যা : বন্যার পানির উচ্চতা, পানির গতি ও বন্যার স্থায়িত্বের উপর ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি নির্ভর করে। নিচু ও মাঝারি নিচু এলাকা বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। ফলে ফসল বিশেষ করে ধানক্ষেত ডুবে যায়। সাধারণত আমন ধান রোপণের সময় বা রোপণের পর বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে ঢল বন্যায় হাওর অঞ্চলে বোরো ধান পাকার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

চিত্র-৪.৯ : বন্যা

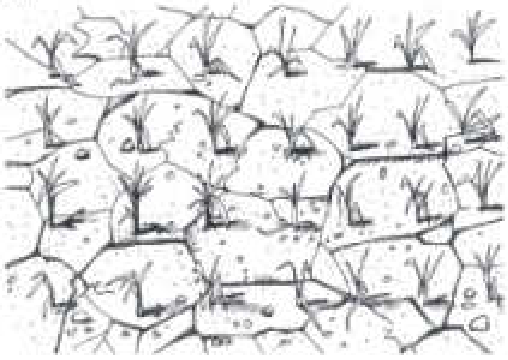

চিত্র-৪.১০ : খরা কবলিত ধানক্ষেত

কাজ : শিক্ষার্থীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে যাও। এক দল অতিবৃষ্টি এবং অপর দল শিলাবৃষ্টির কারণে ফসলের কী কী ক্ষতি হয় তার তালিকা তৈরি করে বোর্ডে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, তীব্র খরা, মাঝারি খরা, সাধারণ খরা

পাঠ-৭ : কৃষি পরিবেশ অঞ্চল

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। প্রায় সব ফসলই এদেশের মাটিতে জন্মায়। তবে সব এলাকায় সব ফসল জন্মায় না। ফসল জন্মানো নির্ভর করে এলাকার পরিবেশের উপর। অতএব এদেশে ফসল তথা কৃষি কার্যক্রম চালাতে এলাকাভিত্তিক কৃষি পরিবেশ জানা দরকার। অর্থাৎ কৃষি পরিবেশ অঞ্চল কৃষি কার্যক্রমে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

আমরা জানি বাংলাদেশের কোথাও বৃষ্টিপাত বেশি আবার কোথাও কম হয়। কোথাও তাপমাত্রা কম এবং কোথাও বেশি। একেক অঞ্চলের মাটি একেক প্রকার। এসবই হলো পরিবেশ। এ পরিবেশের জন্যই বাংলাদেশের রাজশাহীতে আমের ফলন ভালো, দিনাজপুরে লিচুর ফলন ভালো, শ্রীমঙ্গলে চা ও কমলার ফলন ভালো, যশোরে খেজুরের ফলন ভালো। তাই আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে।

কাজ-১ : শিক্ষক বাংলাদেশের একটি মানচিত্র বোর্ডে ঝুলাবেন। শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে বাংলাদেশের কোন জেলায় কোন ফসল ভালো জন্মে সেগুলোর নাম ও জেলার নাম টুকরা কাগজে লিখে মানচিত্রে বসাতে বলবেন। পরিশেষে ফসলসমৃদ্ধ মানচিত্রটি ব্যাখ্যা করবেন।

ভিডিও প্রদর্শন: শিক্ষক বাংলাদেশের বিভিন্ন ফসলের এলাকাভিত্তিক ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করে এক নজরে বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরবেন।

বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশ অঞ্চল

সর্বশেষ ১৯৮৮–১৯৮৯ সালে বাংলাদেশকে ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদনের জন্য ফসল নির্বাচন, ফসল পরিচর্যা, রোগবালাই দমন ও ব্যবস্থাপনা এই সকল ক্ষেত্রে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল বিবেচনায় নেওয়া হয়।

পরিবেশ অঞ্চল গঠনে কতগুলো নির্দিষ্ট বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়। প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে ভূমি, কৃষি আবহাওয়া, মৃত্তিকা এবং পানি পরিস্থিতি। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে আবার বিভাজন রয়েছে। যেমন– ভূমির শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে ৫ ভাগে। উঁচু ভূমি, মাঝারি উঁচু ভূমি, মাঝারি নিচু ভূমি, নিচু ভূমি এবং অতি নিচু ভূমি।

কৃষি আবহাওয়া প্রসঙ্গে বিবেচনায় নেওয়া হয় খরিপ–পূর্ব আবহাওয়া, খরিপ আবহাওয়া, রবি আবহাওয়া ও চরম তাপমাত্রা।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল নির্ধারণে পানি পরিস্থিতি বা মাটির অর্দ্রতার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ ছাড়া নদীর অববাহিকা, হাওর–বাঁওড় এলাকাও বিবেচনায় নেওয়া হয়।

মৃত্তিকার শ্রেণি বিবেচনায় বেলে মাটি, এঁটেল মাটি, বেলে দোআঁশ, এঁটেল দোআঁশ এবং এর পাশাপাশি মাটির p^Hও (অম্লত্ব–ক্ষারত্ব) বিবেচ্য।

পাঠ– ৮ : কৃষি পরিবেশ অঞ্চল অনুযায়ী ফসল বৈচিত্র্য

কৃষি পরিবেশের কারণে এক এক অঞ্চলে আমরা এক একটি বিশেষ ফসলের প্রাধান্য দেখতে পাই। যদিও ধান, পাট,গম, আলু ইত্যাদি ফসল প্রায় সকল কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে উৎপাদন করা হয়।

পরিবেশ অঞ্চল ১ দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও নিয়ে গঠিত। এখানকার বিশেষ ফসল হচ্ছে লিচু ও আম। এখন এই এলাকায় চা এবং কমলার চাষও শুরু হয়েছে।

পরিবেশ অঞ্চল ২–এ রয়েছে তিস্তার চর। নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার কিছু কিছু অংশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বিশেষ ফসল চিনাবাদাম, কাউন। পরিবেশ অঞ্চল ৩ ও ৪ এলাকায় রয়েছে রংপুর ও বগুড়ার অংশবিশেষ। এই এলাকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তামাক এবং সবজি।

পরিবেশ অঞ্চল ৫ ও ৬ চলন বিল, আত্রাই ও পুনর্ভবা নদী এলাকার নিচু জমি নিয়ে গঠিত যা নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। এই এলাকার বৈশিষ্ট্য হলো পাটি, বেত উৎপাদন। এখন তরমুজ ও রসুন ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে।

পরিবেশ অঞ্চল ৭–এ পড়েছে কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জ জেলার ব্রহ্মপুত্র চর এলাকাগুলো। এ সকল অঞ্চলের বিশেষ ফসল হচ্ছে চিনাবাদাম ও মিষ্টি কুমড়া।

ব্রহ্মপুত্র পাড় এলাকাগুলো পরিবেশ অঞ্চল ৮এর অন্তর্ভুক্ত। শেরপুর ও জামালপুর জেলার অংশ বিশেষ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশ অঞ্চল ৮–এর বিশেষ ফসল পানিফল। পরিবেশ অঞ্চল ৯–এ পড়েছে শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চল। পরিবেশ অঞ্চল ৯–এ প্রায় সকল ফসলই হয়।

পরিবেশ অঞ্চল ১০ জুড়ে রয়েছে পদ্মার চরাঞ্চল। চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং রাজশাহী জেলার অংশ বিশেষ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানে চিনাবাদাম প্রধান ফসল। পরিবেশ অঞ্চল ১১ পুরাতন গঙ্গা বিধৌত এলাকা। ঝিনাইদহ, যশোর ও সাতক্ষীরার অনেক এলাকা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত । এখানকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফসল কার্পাস তুলা। পরিবেশ অঞ্চল ১২–এ রয়েছে পদ্মার পাড়। ফরিদপুর, মাদারীপুর ও পাবনা জেলার অনেক এলাকা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বিশেষ ফসল বোনা আমন ও তাল। পরিবেশ অঞ্চল ১৩–এ রয়েছে খুলনার উপকূল অঞ্চল। এই এলাকার বৈশিষ্ট্য হলো সুন্দরবন। পরিবেশ অঞ্চল ১৪–এ রয়েছে গোপালগঞ্জের বিলের পাড় এলাকা, এখানকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদ্ভিদ হলো তালগাছ ও খেজুর। পরিবেশ অঞ্চল ১৫–এ রয়েছে আড়িয়াল বিল এলাকা। এখানে বোনা আমন প্রধান বৈশিষ্টপূর্ণ ফসল।

পরিবেশ অঞ্চল ১৬–এ মধ্য মেঘনা এলাকা রয়েছে। কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরের কিছু কিছু এলাকা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানে জমি মাঝারি উঁচু। এখানে আলুসহ অন্যান্য সবজি ও কলা জন্মায়। পরিবেশ অঞ্চল ১৭–এ রয়েছে কুমিল্লা–নোয়াখালীর সীমান্ত এলাকা। এখানে চিনাবাদাম, ভুট্টাসহ সাধারণ ফসল জন্মায়। পরিবেশ অঞ্চল ১৮–এ রয়েছে ভোলার চর। এখানে নারিকেল ও পান বিশেষ ফসল। পরিবেশ অঞ্চল ১৯–এ রয়েছে পূর্ব মেঘনা এলাকা। কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরের অনেক এলাকা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বিশেষ ফসল বোনা আমন। পরিবেশ অঞ্চল ২০–এ রয়েছে সিলেটের টাঙ্গুয়ার হাওরসহ হাওর এলাকাগুলো। এখানে বোরো ধান ও মাছ উৎপাদন এলাকাগুলো রয়েছে। পরিবেশ অঞ্চল ২১–এ রয়েছে সুরমা–কুশিয়ারার দুই পাড়। সুনামগঞ্জের অনেক এলাকা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বোরো ধান, মাছ ও সবজি উৎপাদন হয়। উত্তর–পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ের পাদদেশগুলো পরিবেশ অঞ্চল ২২–এর অধীনে পড়েছে। নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার কিছু কিছু অংশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। সুপারি, লেবু, কমলা, খাসিয়া পান এই এলাকার বৈশিষ্ট্য। এখন এসব এলাকায় আগর উৎপাদন হচ্ছে। পরিবেশ অঞ্চল ২৩–এ রয়েছে চট্টগ্রাম–কক্সবাজার উপকূল অঞ্চল। এখানকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফসল পান। পরিবেশ অঞ্চল ২৪–এ রয়েছে সেন্টমার্টিন কোরাল দ্বীপ। এখানকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদ্ভিদ হচ্ছে নারিকেল।

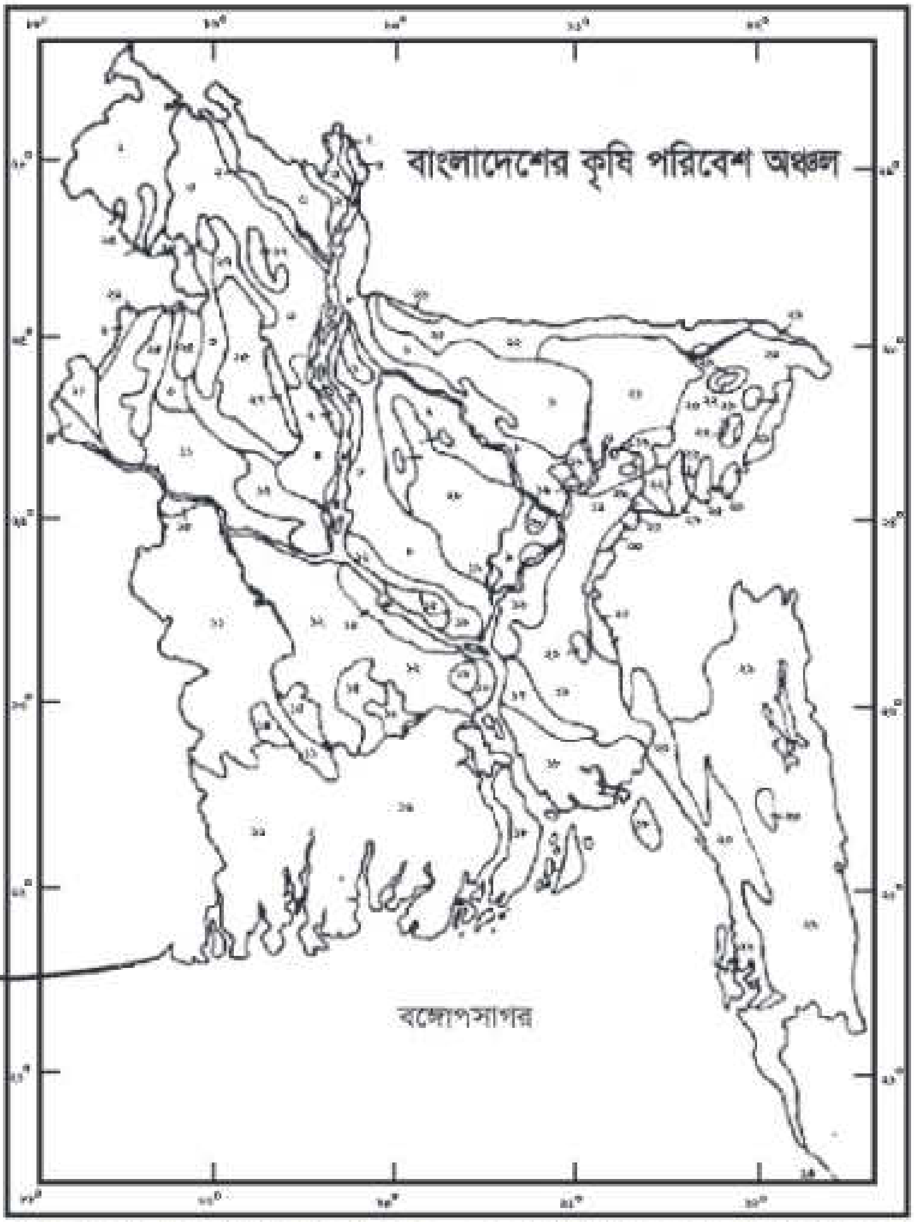

১. পুরাতন হিমালয় পাদদেশীয় সমভূমি অঞ্চল ২. সক্রিয় তিস্তা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল ৩. তিস্তা বাঁক প্লাবিত ভূমি অঞ্চল ৪. করতোয়া-বাঙালি প্লাবিত ভূমি অঞ্চল ৫. নিম্নতর আত্রাই অববাহিকা অঞ্চল ৬. নিম্নতর পুনর্ভবা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল ৭. সক্রিয় ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল ৮. নতুন ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল ৯. পুরাতন ব্রহ্মপুত্র প্লাবিত ভূমি অঞ্চল ১০. সক্রিয় গঙ্গা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল ১১. উঁচু গঙ্গা নদী প্লাবিত ভূমি অঞ্চল ১২. নিম্ন গঙ্গানদী প্লাবিত ভূমি অঞ্চল ১৩. গঙ্গার জোয়ার-ভাটা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল ১৪. গোপালগঞ্জ- খুলনা বিল অঞ্চল ১৫. আড়িয়াল বিল অঞ্চল ১৬. মধ্য-মেঘনা নদী প্লাবিত ভূমি অঞ্চল ১৭. নিম্নতর মেঘনা নদী প্লাবিত ভূমি অঞ্চল ১৮. নতুন মেঘনা নদী প্লাবিত ভূমি অঞ্চল ১৯. পুরানো মেঘনা মোহনা প্লাবিত ভূমি অঞ্চল ২০. সুরমা-কুশিয়ারা পূর্বাঞ্চল প্লাবিত ভূমি অঞ্চল ২১. সিলেট অববাহিকা অঞ্চল ২২. উত্তর ও পূর্বাঞ্চল পাদদেশীয় সমভূমি অঞ্চল ২৩. চট্টগ্রাম উপকূল সমভূমি অঞ্চল ২৪. সেন্টমার্টিন প্রবাল দ্বীপ অঞ্চল ২৫. সমতল বরেন্দ্র অঞ্চল ২৬. উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চল ২৭. উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বরেন্দ্র অঞ্চল ২৮. মধুপুর অঞ্চল ২৯. উত্তরাঞ্চলীয় ও পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য অঞ্চল ৩০. আখাউড়া সোপান অঞ্চল।

পরিবেশ অঞ্চল ২৫, ২৬, ও ২৭ এলাকাজুড়ে রয়েছে যথাক্রমে রাজশাহী, বগুড়া ও দিনাজপুরের বরেন্দ্র অঞ্চল। এখানে উঁচু এলাকায় প্রায় সকল ফসলই ফলে। পরিবেশ অঞ্চল ২৮ মধুপুর থেকে ঢাকার তেজগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত লালমাটি অঞ্চল। এখানকার বিশেষ বৃক্ষ হচ্ছে শাল। এখানকার ফসল হচ্ছে কাঁঠাল ও আনারস। সকল পাহাড়ি অঞ্চল পরিবেশ অঞ্চল ২৯–এর অন্তর্গত। রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম ও মৌলভীবাজার ছাড়াও অন্যান্য জেলার পাহাড়ি এলাকাগুলো এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার বিশেষ ফসল চা। পরিবেশ অঞ্চল ৩০–এ রয়েছে আখাউড়ার লালমাটি অঞ্চল। এখানকার প্রধান ফসল কাকরোল এবং মুকুন্দপুরী পেয়ারা।

এই বিস্তৃত বিবরণের মূল উদ্দেশ্য হলো এই কথাটি জানানো যে, বাংলাদেশ ছোট দেশ হলেও এর কৃষি বৈচিত্র্য বিশাল। যাহোক, পরিবেশ অঞ্চল ৩, ৯, ১১ এবং আংশিকভাবে ১৬ উদার কৃষি পরিবেশ এলাকা। এই এলাকাজুড়ে উৎপন্ন ধান–পাটসহ নানা ফসলের জন্য বাংলাদেশ 'সোনার বাংলা' নামে অভিহিত।

কাজ : তোমার অঞ্চলে কী ধরনের ফসল ফলে তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. .... মৌসুমে সেচের প্রয়োজন বেশি।

২. তীব্র খরায় .... ভাগ ফলন ঘাটতি হয়।

৩. বৃষ্টিপাতের সাথে যখন বরফ খণ্ড পতিত হয় তখন তাকে .... বলে।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালবৈশাখীর সাথে .... হয়।

মিলকরণ

	বামপাশ	ডানপাশ
১.	চৈত্র থেকে ভাদ্র মাস	খরিপ-২ মৌসুমে
২.	তাপ ও বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে	কৃষিপ্রধান দেশ
৩.	আবহাওয়া ও জলবায়ু অনুকূলে থাকলে	ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
৪.	বাংলাদেশ একটি	রবি মৌসুম

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. খরা বলতে কী বোঝ?

খ. স্বল্প দিবা উদ্ভিদ কাকে বলে?

গ. শিলাবৃষ্টিতে ফসলের কী ধরনের ক্ষতি হয়?

ঘ. অতিবৃষ্টি বলতে কী বোঝ?

রচনামূলক প্রশ্ন

ক. ফসল উৎপাদনে আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর।
খ. বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের বর্ণনা দাও।
গ. মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলের বর্ণনা দাও।
ঘ. কৃষি মৌসুমের বর্ণনা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে শিলাবৃষ্টি কখন হয়-

ক. বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে   খ. আষাঢ় ও শ্রাবণে
গ. ফাল্গুন ও চৈত্রে   ঘ. চৈত্র ও বৈশাখে

২. দিবা নিরপেক্ষ উদ্ভিদগুলো হলো-

i. চিনাবাদাম, টমেটো, পেঁপে
ii. আউশ ধান, বেগুন, কলা
iii. ভুট্টা, ফুলকপি, আলু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii
গ. i ও ii   ঘ. ii ও iii

নিচের চিত্র দুটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

চিত্র-১

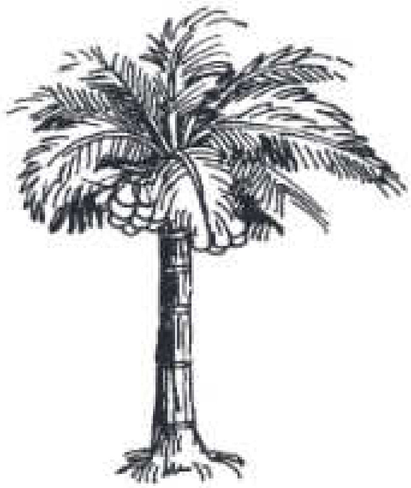
চিত্র-২

৩. চিত্র–২ এর উদ্ভিদটি –

ক. সেন্টমার্টিনের কোরাল দ্বীপের খ. পাহাড়ি অঞ্চলের
গ. সিলেটের টাঙ্গুয়ার হাওরের ঘ. ময়মনসিংহ অঞ্চলের

৪. চিত্র–১–এর উদ্ভিদটি–

i. অর্থকরি ফসল
ii. পানীয় প্রদানকারী
iii. গুল্মজাতীয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সাদিকের বাড়িটি কম বৃষ্টিপাতপ্রবণ অঞ্চলে হলেও প্রচুর শাক–সবজি উৎপাদন হয়। সাদিক কিছু টাটকা সবজি নিয়ে তার মায়ের সাথে চট্টগ্রামের টিলাতলে মামাবাড়ি বেড়াতে যায়। সেখানে একদিন সে দেখে হঠাৎ করে আকাশ ঘনকালো মেঘে ঢেকে আসে ও ঝড়– বাতাস শুরু হয় এরপর শুরু হয় বৃষ্টি।

ক. ফসলের মৌসুম বলতে কী বোঝ?
খ. আলুকে কার্ডিনাল তাপমাত্রার সবজি বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের আলোকে সাদিকের কৃষি অঞ্চলের ফসলের বৈশিষ্ট্য মৌসুম অনুযায়ী বর্ণনা কর।
ঘ. সাদিক ও তার মামা বাড়ি অঞ্চলে আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যের তুলনা কর।

২.

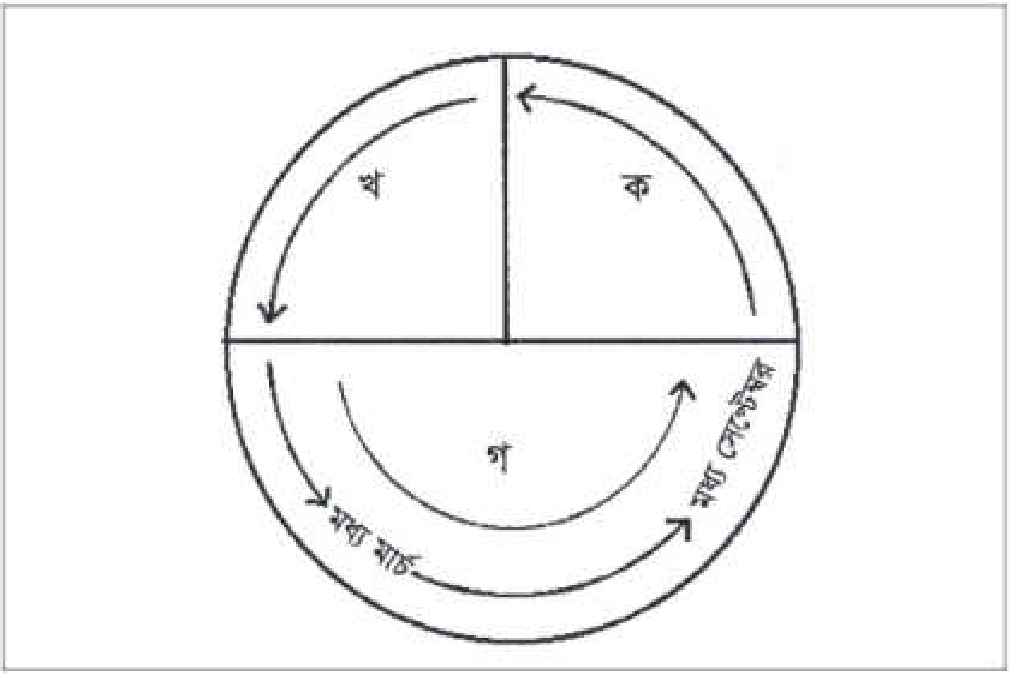

চিত্র– বার মাসের ভিত্তিতে কৃষি মৌসুমের গ্রাফ

ক. আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভিত্তিতে বাংলাদেশকে কয়টি কৃষি অঞ্চলে ভাগ করা হয়?
খ. কোন পরিস্থিতিতে শীতকালে ফসলের রোগজীবাণুর বিস্তার ঘটে– ব্যাখ্যা কর।
গ. গ্রাফে চিহ্নিত কৃষি মৌসুমের কোন অংশটিতে সেচের তেমন প্রয়োজন হয় না, কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. চিত্রে 'গ' চিহ্নিত কৃষি মৌসুমের ফসলে তাপমাত্রার প্রভাব মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষিজ উৎপাদন

কৃষিজ উৎপাদন বলতে ফসল, গৃহপালিত পশুপাখি এবং মাছ উৎপাদনকে বোঝায়। এ অধ্যায়ে ফসল উৎপাদনের মধ্যে শস্য চাষ (ভুট্টা), ফুল চাষ (রজনীগন্ধা ও গাঁদা) এবং ফলের চাষ (পেয়ারা ও পেঁপে) পদ্ধতি, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহ পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে মাছ চাষ ও রোগ ব্যবস্থাপনা (কৈ মাছ), পাখি পালন ও রোগ ব্যবস্থাপনা (মুরগি) এবং গৃহপালিত পশু পালন ও রোগ ব্যবস্থাপনা (ছাগল) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সবশেষে কৃষি উৎপাদনে আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতির বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

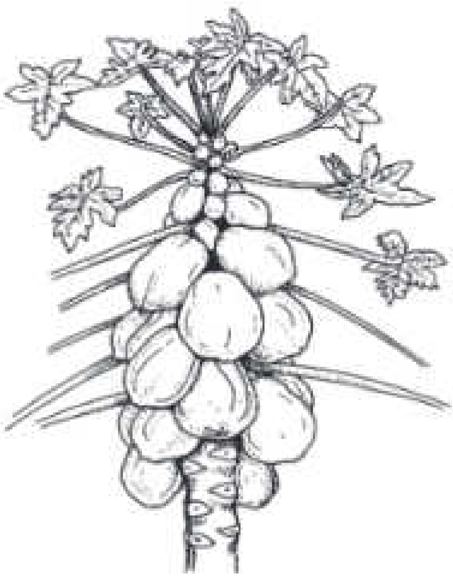

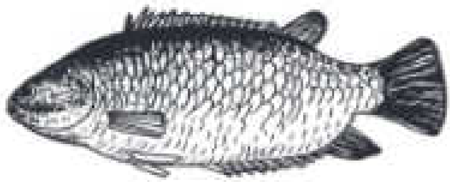

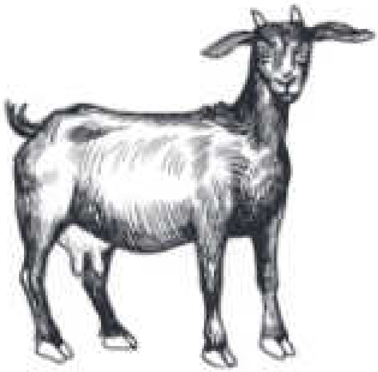

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- শস্য চাষ (ভুট্টা) পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব ;
- বিভিন্ন প্রকার ফুল চাষ ও ফল চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব ;
- মাছ চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব ;
- মাছের রোগ প্রতিরোধের উপায় এবং রোগ ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করতে পারব ;
- গৃহপালিত পাখি পালন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব ;
- গৃহপালিত পশুপাখির রোগ ব্যবস্থাপনা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে পারব ;
- কৃষিজ উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে পারব।

পাঠ–১ : ভুট্টা চাষ পদ্ধতি

ভুট্টা একটি অধিক ফলনশীল ও বহুমুখী ব্যবহার সম্পন্ন দানা শস্য। বাংলাদেশে ভুট্টার চাষ বাড়ছে। ভুট্টা বর্ষজীবী গুল্ম প্রকৃতির। একই গাছে পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল জন্মে। পুরুষ ফুল একটি মঞ্জরিদণ্ডে বিন্যস্ত হয়ে গাছের মাথায় বের হয়। স্ত্রী ফুল গাছের মাঝামাঝি উচ্চতায় কাণ্ড ও পাতার অক্ষকোণ থেকে মোচা আকারে বের হয়। স্ত্রী ফুল নিষিক্ত হলে মোচার ভিতরে দানার সৃষ্টি হয়। ধান ও গমের তুলনায় ভুট্টা দানার পুষ্টিমান বেশি। ভুট্টার দানা মানুষের খাদ্য হিসেবে এবং এর রসাল গাছ ও সবুজ পাতা উন্নত মানের গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গবাদিপশু, হাঁস–মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবে আমাদের দেশে ভুট্টা দানার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

চিত্র-৫.১: ভুট্টা গাছ

জাত : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ভুট্টার অনেকগুলো উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করেছে। তার মধ্যে বর্ণালি, শুভ্রা, মোহর, বারি ভুট্টা–৫, বারি ভুট্টা–৬, বারি ভুট্টা–৭, বারি হাইব্রিড ভুট্টা–১, বারি হাইব্রিড ভুট্টা–২, বারি হাইব্রিড ভুট্টা–৩ অন্যতম। এছাড়া খই (পপ কর্ণ) এর জন্য বের করেছে খই ভুট্টা এবং কচি অবস্থায় খাওয়ার জন্য বের করেছে বারি মিষ্টি ভুট্টা–১। এর বাইরে বিভিন্ন বীজ কোম্পানি বিদেশ থেকে হাইব্রিড জাতের ভুট্টা বীজ আমদানি করে থাকে।

মাটি : বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি ভুট্টা চাষের জন্য উত্তম। তবে খেয়াল রাখতে হবে জমিতে যেন পানি না জমে।

বপন সময় : আমাদের দেশে রবি মৌসুমে অক্টোবর–নভেম্বর এবং খরিপ মৌসুমে মধ্য ফেব্রুয়ারি–মার্চ পর্যন্ত সময় বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজের হার ও বপন পদ্ধতি : বারি ভুট্টা জাতের জন্য হেক্টর প্রতি ২৫–৩০ কেজি এবং খই ভুট্টার জন্য ১৫–২০ কেজি হারে বীজ সারিতে বুনতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৭৫ সেমি এবং সারিতে ২৫ সেমি দূরত্বে ১টি অথবা ৫০ সেমি দূরত্বে ২টি গাছ রাখতে হবে।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ : আমাদের দেশে রবি মৌসুমে ভুট্টার চাষ বেশি হয়ে থাকে। ৪–৫টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।

ভুট্টা চাষে বিভিন্ন প্রকার সারের পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো :

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	১৭২–৩১২
টিএসপি	১৬৮–২১৬
এমওপি	৯৬–১৪৪
জিপসাম	১৪৪–১৬৮

জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে মোট ইউরিয়ার এক–তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু ছিটিয়ে জমি চাষ দিতে হবে। এছাড়াও এ সময় হেক্টর প্রতি জিংক সালফেট ১০–১৫ কেজি, বোরন সার ৫–৭ কেজি এবং গোবর সার ৫ টন প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। বাকি ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে ভাগ করে, প্রথম কিস্তি বীজ গজানোর ২৫–৩০ দিন পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ গজানোর ৪০–৫০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজানোর ৩০ দিনের মধ্যে জমি থেকে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে। চারার বয়স এক মাস না হওয়া পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। দ্বিতীয় কিস্তির ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের সময় দুই সারির মাঝখান থেকে মাটি গাছের গোড়া বরাবর তুলে দিতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসেবে খাদ্যশস্য ফসলের একটি তালিকা তৈরি কর ।

নতুন শব্দ : উপরি প্রয়োগ, ভুট্টার মোচা

পাঠ–২ : ভুট্টা চাষে পরিচর্যা ও ফসল সংগ্রহ

চিত্র–৫.২ : বিভিন্ন বয়সের ভুট্টা গাছ

সেচ প্রয়োগ : উচ্চ ফলনশীল জাতের ভুট্টার আশানুরূপ ফলন পেতে হলে রবি মৌসুমে ৩–৪টি সেচ দেওয়া প্রয়োজন। ৫ পাতা পর্যায়ে প্রথম, ১০ পাতা পর্যায়ে দ্বিতীয়, মোচা বের হওয়ার সময়ে তৃতীয় এবং দানা বাঁধার পূর্বে চতুর্থ সেচ দিতে হয়। ভুট্টার জমিতে যাতে পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

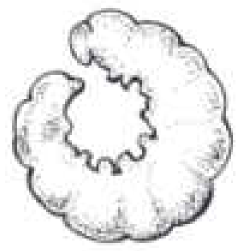

চিত্র–৫.৩ : কাটুই পোকার লার্ভা

পোকা দমন ব্যবস্থাপনা : ভুট্টা ফসলে পোকা–মাকড়ের আক্রমণ কম হয়। তবে চারা অবস্থায় কাটুই পোকার লার্ভা গাছের গোড়া কেটে দেয়। এরা দিনের বেলায় মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে এবং রাতে বের হয়। সদ্য কেটে ফেলা গাছের চারপাশের মাটি খুড়ে পোকার লার্ভা বের করে মেরে ফেলতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে ফুরাডান অথবা ডারসবার্ন অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করে জমিতে সেচ দিতে হবে।

ভুট্টা ফসলের রোগ : ভুট্টা ফসলে বেশ কয়েকটি রোগ দেখা দিতে পারে। যেমন–ভুট্টার বীজ পচা ও চারা মরা রোগ, পাতা ঝলসানো রোগ, কাণ্ড পচা রোগ, মোচা ও দানা পচা রোগ। এ রোগগুলো বিভিন্ন ধরনের বীজ ও মাটিবাহিত ছত্রাকের আক্রমণে হয়ে থাকে। ভুট্টার বীজ বপনের সময় মাটিতে রস বেশি এবং তাপমাত্রা কম থাকলে বীজ পচা ও চারা মরা রোগ দেখা দেয়। পাতা ঝলসানো রোগে আক্রান্ত গাছের নিচের দিকের পাতায় লম্বাটে ধূসর বর্ণের দাগ দেখা যায়। পরে তা গাছের উপরের অংশে ছড়িয়ে পড়ে। রোগের আক্রমণ বেশি হলে পাতা আগাম শুকিয়ে যায় এবং গাছ মরে যায়।

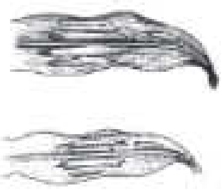

চিত্র–৫.৪ : পাতা ঝলসানো রোগ

রোগ দমন পদ্ধতি

১) রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করতে হবে।

২) বীজ বপনের পূর্বে শোধন করে নিতে হবে।

৩) ভুট্টা কাটার পর পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৪) একই জমিতে বার বার ভুট্টা চাষ বন্ধ করতে হবে।

ভুট্টা সংগ্রহ ও মাড়াই : মোচা চকচকে খড়ের রং ধারণ করলে এবং পাতা কিছুটা হলদে হলে, দানার জন্য ভুট্টা সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। ভুট্টা গাছের মোচা ৭৫–৮০% পরিপক্ব হলে ফসল সংগ্রহ করা যাবে। মোচা সংগ্রহের পর ৪–৫ দিন রোদে শুকাতে হবে। অতঃপর হস্ত বা শক্তিচালিত মাড়াই যন্ত্র দ্বারা দানা ছাড়িয়ে বাছাই–ঝাড়াই করে সংরক্ষণ করতে হবে।

জীবনকাল : রবি মৌসুমে ভুট্টা গাছের জীবনকাল ১৩৫–১৫৫ দিন এবং খরিপ মৌসুমে জীবনকাল ৯০–১১০ দিন।

ফলন : বাংলাদেশে রবি মৌসুমে ভুট্টার ফলন বেশি হয় এবং খরিপ মৌসুমে ফলন কম হয়। জাত ও মৌসুম ভেদে ভুট্টার ফলন ৩.৫–৮.৫ টন/হেক্টর হয়ে থাকে।

চিত্র–৫.৫ : হস্তচালিত মাড়াই যন্ত্র

কাজ : শিক্ষার্থীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে ভুট্টা কীভাবে সংগ্রহ করতে হয় সে বিষয়ে খাতায় লেখ এবং উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : কাটুই পোকা, ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র

পাঠ–৩ : রজনীগন্ধা ফুলের চাষ পদ্ধতি

সাদা ও সুবাসিত রজনীগন্ধা ফুলটি আমাদের সকলের প্রিয় একটি ফুল। রাতের বেলা এ ফুল সুগন্ধ ছড়ায় বলে একে রজনীগন্ধা বলে। উৎসব, অনুষ্ঠান, গৃহসজ্জা, তোড়া, মালা, অঙ্গসজ্জায় ফুলটি বেশি ব্যবহৃত হয়। ফুলের পাপড়ির সারি অনুসারে রজনীগন্ধাকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেসব জাতে পাপড়ি এক সারিতে থাকে তাকে সিঙ্গেল বলে। পাপড়ি দুই বা ততোধিক সারিতে থাকলে ডাবল বলে।

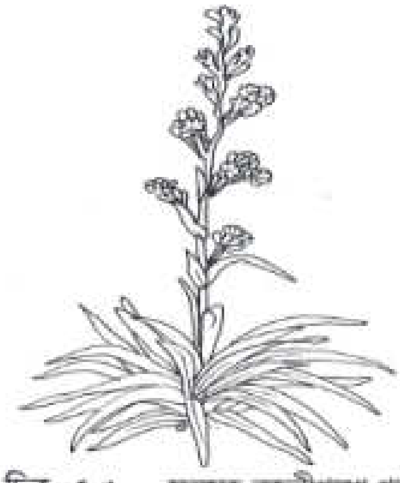

চিত্র–৫.৬ : ফুলসহ রজনীগন্ধা গাছ

বংশবিস্তার : বাংলাদেশে কন্দ থেকে রজনীগন্ধার বংশবিস্তার করা হয়। কন্দগুলো দেখতে পেঁয়াজের মতো। শীতকালে এগুলো মাটির নিচে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। শীতের শেষে কন্দের ঝাড়গুলো বের করে কন্দ আলাদা করা হয় । রোপণের জন্য ২–৩ সেমি আকারের কন্দ হলেই চলে।

কন্দ রোপণ : রজনীগন্ধার জন্য পর্যাপ্ত আলো–বাতাসযুক্ত জমি নির্বাচন করা উচিত। দোআঁশ ও বেলে–দোআঁশ মাটিতে রজনীগন্ধা ভালো জন্মে। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে কন্দ রোপণ করা হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫–৩০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০–১৫ সেমি হিসেবে কন্দগুলো ৪–৫ সেমি গভীরতায় বসাতে হবে। কন্দ বসানোর ৩–৪ মাস পর গাছ ফুল দেয়।

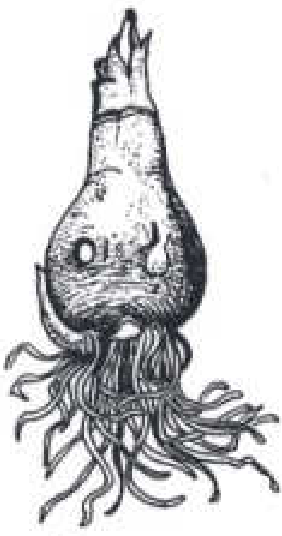

চিত্র–৫.৭ : কন্দ

সার প্রয়োগ : ৩–৪টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। জমি তৈরির সময় হেক্টর প্রতি ১০ টন পচা গোবর, ২০০ কেজি ইউরিয়া, ৩০০ কেজি টিএসপি, ৩৫০ কেজি এমওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। কন্দ রোপণের ৩০–৪৫ দিন পর আবার ১২৫ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা : রজনীগন্ধার জমিতে সব সময় পর্যাপ্ত রস থাকা দরকার। আবার পানি জমাও উচিত নয়, পানি জমলে কন্দগুলো পচে যেতে পারে। সেজন্য জমির অবস্থা বুঝে সেচ দেওয়া দরকার। কন্দ রোপণের

ঠিক পরে একবার, গাছ গজানোর পরে একবার ও গাছের উচ্চতা ১০-১৫ সেমি হলে আরেকবার সেচ দিতে হবে। এছাড়া ফুল ফোটা শুরু হলে, দুই-একবার সেচ দিলে বেশি করে ফুল ফোটে এবং ফুল ঝরাও কমে যায়। প্রতিবার সেচের পর, জমিতে জো এলে নিড়ানি দিয়ে মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

রজনীগন্ধা গাছে ক্ষতিকারক পোকামাকড় তেমন দেখা যায় না। তবে বর্ষাকালে ছত্রাকজনিত গোড়া পচা রোগ অনেক সময় বেশ ক্ষতি করে। এ রোগের কারণে গাছের নিচের দিকে মাটির কাছে পচন ধরে ও গাছ শুকিয়ে মারা যায়। এ রোগ দমনের জন্য জমিতে যাতে পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আক্রান্ত গাছের গোড়ার মাটিতে শতক প্রতি টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করে দিতে হবে।

চিত্র-৫.৮ : রজনীগন্ধা

ফুল কাটা : বাজারে রজনীগন্ধা বিক্রি হয় মূলত লম্বা পুষ্পদণ্ড বা ডাঁটাসহ অথবা ডাঁটা ছাড়া ঝরা ফুল হিসেবে। ঝরা ফুল মালা তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। ফুল ফোটার পূর্বে ফুলের ডাঁটাসহ কেটে ফুল সগ্রহ করা হয়। সন্ধ্যা বা ভোরের দিকে ফুল কাটা ভালো। কাটার পর ডাঁটার নিচের অংশ পানিতে ডুবিয়ে রাখা উচিত। এতে ফুলের সতেজতা ও উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। ডাঁটাসহ ফুল আঁটি বেঁধে কালো পলিথিনে জড়িয়ে বাজারে পাঠানো উচিত।

কাজ : পোস্টার পেপারে রজনীগন্ধার ফুল সগ্রহ ও বাজারজাতকরণের চিত্র অঙ্কন করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : সিঙ্গেল রজনীগন্ধা, ডাবল রজনীগন্ধা, কন্দ

পাঠ-৪ : গাঁদা ফুলের চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশে গাঁদা ফুল খুবই জনপ্রিয়। এর চাষ সহজ। এ ফুল উদ্যানে, পার্কে, টবে বারান্দায় চাষ করা যায়। ফুলটি নানাবিধ উৎসব, অনুষ্ঠান, গৃহসজ্জা, মালা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ফুলটির রং, গঠন বৈচিত্র্য ও কোমলতা সকল শ্রেণির মানুষকে আকৃষ্ট করে। গাঁদা ফুলের পাতার রস শরীরের ক্ষত স্থানে লাগালে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

চিত্র-৫.৯ : টবে ফুলসহ গাঁদা গাছ

জাত পরিচিতি : বাংলাদেশে দুই প্রজাতির গাঁদা ফুল চাষ করা হয়; যথা-ক) আফ্রিকান গাঁদা – এ প্রজাতির গাছ উচ্চতায়

প্রায় ১০০ সেমি লম্বা, ফুল একরঙা ও বেশ বড় হয়। জাত অনুযায়ী ফুল হলুদ, সোনালি, বাসন্তি, কমলা প্রভৃতি রঙের হয়ে থাকে। খ) ফরাসি গাঁদা– এ প্রজাতির গাছ ১৫–৩০ সেমি লম্বা, শক্ত, ঝোপালো এবং ফুল ছোট ও লাল রঙের হয়ে থাকে।

চারা তৈরি : বীজ ও শাখা কলমের মাধ্যমে গাঁদা গাছের চারা তৈরি করা যায়। বর্ষার সময় বীজতলায় পাতলা করে বীজ বুনে গাঁদার চারা তৈরি করা হয়। সবজির বীজতলার মতোই গাঁদা ফুলের বীজতলা তৈরি করতে হবে। চারার বয়স এক মাস হলে রোপণ উপযোগী হয়। শাখার সাহায্যে চারা তৈরি করার জন্য ফুল দেওয়ার পর সুস্থ–সবল গাছ নির্বাচন করে তা থেকে ২.৫ সেমি চওড়া ও ৫–১০ সেমি লম্বা শাখা কেটে নিতে হবে। কাটা শাখাগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে বালি ও দোআঁশ মাটির মিশ্রণে বসাতে হবে। এমনভাবে বসাতে হবে যেন কমপক্ষে একটি গিঁট মাটির নিচে থাকে। নিয়মিত পরিচর্যা করলে শাখাগুলোতে প্রচুর শিকড় ও ডালপালা গজাবে। বর্ষাকালে আবার শাখা কলম থেকে ডাল কেটে একইভাবে বসাতে হবে। প্রায় মাসখানেকের মধ্যে সেগুলোতে পর্যাপ্ত শিকড় গজালে তা রোপণ করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসেবে গাঁদা ফুলের শাখা কলম তৈরির প্রক্রিয়াটি চিত্রসহ খাতায় লিখবে।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ : উঁচু এবং দোআঁশ মাটির জমি গাঁদা চাষের জন্য উত্তম। ৪–৫টি চাষ ও মই দিয়ে জমি ঝুরঝুরা করে তৈরি করতে হবে। বর্ষার শেষের দিকে চারা রোপণ করা ভালো। মূল জমিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪৫ সেমি রাখা হয়। টবে রোপণ করলে খাটো জাতের গাঁদা নির্বাচন করা হয়।

সার প্রয়োগ : শেষ চাষের সময় শতক প্রতি ৪০ কেজি পচা গোবর, ১ কেজি ইউরিয়া, ০.৮০ কেজি টিএসপি, ০.৭০ কেজি এমওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা রোপণের ১–১.৫ মাস পর শুধু ইউরিয়া সার শতক প্রতি ০.৭০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। সার ভালোভাবে জমিতে মিশিয়ে সেচ দিতে হবে। টবে রোপণ করলে প্রতি টবে ২৫০ গ্রাম পচা গোবর, এক চা চামচ করে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার মিশিয়ে টব প্রস্তুত করে চারা রোপণ করতে হবে। রোপণের ১–১.৫ মাস পর আবার এক চামচ ইউরিয়া সার দিতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা : গাছ ছোট অবস্থায় নিয়মিতভাবে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। জমির রস বুঝে ১–২টি সেচ দিলেই চলে তবে গাছে ফুল আসার পরে সেচ দেওয়া ভালো। এতে ফুলের আকার বড় হয় এবং উজ্জ্বলতা বাড়ে। ছোট আকারের বেশি ফুল পাবার জন্য গাছ সামান্য বড় হলে গাছের আগা কেটে ফেলতে হয়। এর ফলে শাখা–প্রশাখা বেশি হয় এবং ফুলও বেশি ধরে। ঝড়–বাতাস, সেচ দেওয়া ও ফুলের ভারে গাছ যাতে হেলে না পড়ে সেজন্য গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

রোগ ও পোকা ব্যবস্থাপনা : গাঁদা ফুলের গাছে রোগ ও পোকার আক্রমণ তেমন দেখা যায় না। তবে ব্যাকটেরিয়াজনিত উইল্ট রোগে গাছ নেতিয়ে পড়ে এবং একসময় পুরো গাছটি শুকিয়ে মারা যায়। রোগটির বিস্তার রোধ করার জন্য আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ফুল সংগ্রহ : ফুল কাঁচি দিয়ে বোঁটাসহ কেটে সংগ্রহ করতে হবে। বোঁটা একটু বেশি রাখলে ফুল বেশি সময় সতেজ থাকে। ফুল তুলে পানি ছিটিয়ে কালো পলিথিনে মুড়ে বাজারে পাঠাতে হবে।

নতুন শব্দ : আফ্রিকান গাঁদা, ফরাসি গাঁদা, শাখা কলম

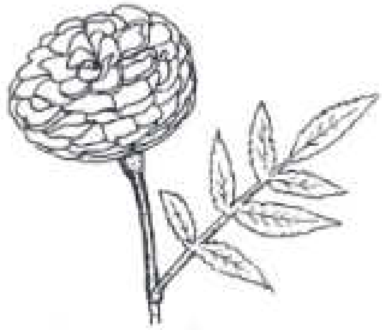

চিত্র–৫.১০ : গাঁদা ফুল

পাঠ–৫ : পেয়ারা চাষ পদ্ধতি

পেয়ারা বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ফল। পেয়ারা ভিটামিন 'সি' এর একটি প্রধান উৎস। দেশের সর্বত্র কম বেশি এ ফল জন্মে থাকে। তবে বাণিজ্যিকভাবে বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা প্রভৃতি এলাকায় এর চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে অনেক ধরনের পেয়ারা দেখা যায় তার মধ্যে কাঞ্চন নগর, স্বরূপকাঠি, মুকুন্দপুরী, কাজী পেয়ারা, বারি পেয়ারা–২, বারি পেয়ারা–৩ জাতগুলো অন্যতম।

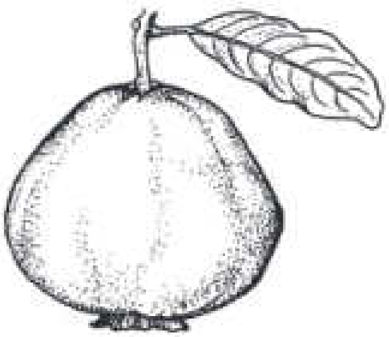

চিত্র–৫.১১ : পেয়ারা

মাটি : পেয়ারা খরা সহিষ্ণু উদ্ভিদ এবং অনেক ধরনের মাটিতে জন্মাতে পারে। এটা কিছুটা লবণাক্ততাও সহ্য করতে পারে। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য উর্বর ও গভীর দোঁআশ মাটি উত্তম।

গর্ত তৈরি : পেয়ারার চারা প্রধানত জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে রোপণ করা হয়। চারা রোপণের জন্য ৪মিটার×৪ মিটার দূরত্বে ৬০ সেমি × ৬০ সেমি × ৬০ সেমি গর্ত তৈরি করা হয়। গর্তের উপরের ৩০ সেমি মাটি একদিকে এবং নিচের ৩০ সেমি মাটি অন্যদিকে রাখতে হয়। এবার জমাকৃত উপরের মাটি গর্তের নিচে দিয়ে এবং নিচের মাটির সাথে ৫–৭ কেজি পচা গোবর সার, ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১৫০ গ্রাম এমওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ১০–১৫ দিন রেখে দিতে হবে।

চারা রোপণ : বীজ থেকে এবং গুটি কলমের মাধ্যমে পেয়ারার চারা তৈরি করা হয়। বীজ অথবা কলমের মাধ্যমে তৈরিকৃত চারা গর্তের মাঝখানে লাগানো হয়। চারাটিকে একটি শক্ত খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে যেন বাতাসে হেলে না পড়ে। গরু–ছাগলের হাত থেকে রক্ষার জন্য বাঁশের তৈরি খাঁচা বা বেড়া দিতে হয়।
সার প্রয়োগ : পেয়ারা গাছে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে সমান তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। সার একেবারে গাছের গোড়ায় না দিয়ে যতদূর পর্যন্ত ডালপালা বিস্তার

লাভ করে সে এলাকার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের পর পানি সেচ অত্যাবশ্যক।

বয়স অনুযায়ী গাছ প্রতি সারের পরিমাণ

সারের নাম	১–৩ বছর
গোবর/কম্পোস্ট	১০–২০ কেজি
ইউরিয়া	১৫০–৩০০ গ্রাম
টিএসপি	১৫০–৩০০ গ্রাম
এমওপি	১৫০–৩০০ গ্রাম

পরিচর্যা : বয়স্ক গাছের ফল সংগ্রহের পর আগস্ট–সেপ্টেম্বর মাসে অঙ্গ ছাঁটাই করা হয়। অঙ্গ ছাঁটাই করলে গাছে নতুন ডালপালা গজায়, ফল ধারণ বৃদ্ধি পায়। গাছকে নিয়মিত ফলবান রাখতে এবং মানসম্পন্ন ফল পেতে কচি অবস্থায় শতকরা ২৫–৫০ ভাগ ফল ছাঁটাই করা প্রয়োজন। ফল ধারণের সময় এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ৭–১০ দিন পর পর পানি সেচ দিলে ফলন বৃদ্ধি পায়।

রোগ ও পোকা ব্যবস্থাপনা : পেয়ারা গাছে অনেক সময় ছত্রাকজনিত রোগ হয়। এ রোগের কারণে প্রথমে ফলের গায়ে ছোট ছোট কালো দাগ দেখা যায় যা ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে পেয়ারার গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে। ফল ফেটে বা পচে যেতে পারে। এ রোগ দমনের জন্য গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গাছে ফল ধরার পর ২৫০ ইসি টিল্ট (প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি) ১৫ দিন পর পর ৩–৪ বার স্প্রে করতে হবে।

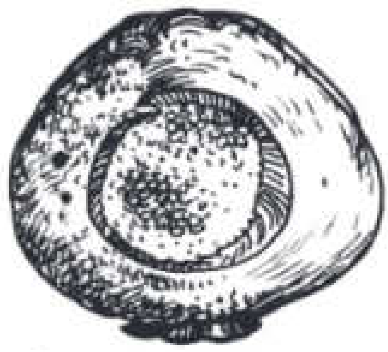

চিত্র-৫.১২ : রোগাক্রান্ত পেয়ারা

ফসল সংগ্রহ : কাজী পেয়ারা ও বারি পেয়ারা বছরে দুইবার ফল দিয়ে থাকে। পেয়ারা পাকার সময় হলে এর সবুজ রং আস্তে আস্তে হলদে সবুজে পরিণত হয়। পেয়ারা গাছের বয়স ও জাত ভেদে ফলনে পার্থক্য দেখা যায়। ৪–৫ বছরের একটি গাছ থেকে বছরে ১৫–২০ কেজি ফল পাওয়া যায়।

কাজ : পোস্টার পেপারে পেয়ারার চারা রোপণের পদ্ধতি অঙ্কন করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : অঙ্গ ছাঁটাই, ফল ছাঁটাই, ছত্রাকজনিত রোগ

পাঠ–৬ : পেঁপে চাষ পদ্ধতি

পেঁপে অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও ঔষধি গুণসম্পন্ন ফল। কাঁচা অবস্থায় তরকারি এবং পাকা অবস্থায় ফল হিসেবে খাওয়া হয়। সারা বছর পেঁপে পাওয়া যায়।

পেঁপের জাত : আমাদের দেশে শাহী, রাঁচি, ওয়াশিংটন, হানিডিউ, পুষা এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা বিভিন্ন ধরনের হাইব্রিড জাতের পেঁপে চাষ করা হয়।

জমি নির্বাচন ও তৈরি : উঁচু ও মাঝারি উঁচু দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি পেঁপে চাষের জন্য উত্তম। তবে উপযুক্ত পরিচর্যার দ্বারা প্রায় সব ধরনের মাটিতেই পেঁপের চাষ করা যায়। জমি ৩/৪ বার উত্তমরূপে চাষ দিতে হয়। পেঁপে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

চারা তৈরি : ভালো মিষ্টি পেঁপে থেকে বীজ সংগ্রহ করে বীজের উপরের সাদা আবরণ সরিয়ে টাটকা অবস্থায় বীজতলায় বা পলিথিন ব্যাগের মাটিতে বীজ বপন করতে হয়। বীজ বপনের পর প্রয়োজনীয় পানি সেচ দিতে হয়। ১৫–২০ দিনের মধ্যে চারা গজায়।

চারা রোপণ পদ্ধতি : পেঁপে সারা বছর চাষ করা যায়। তবে বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য আশ্বিন–কার্তিক বা ফাল্গুন–চৈত্র মাস উত্তম সময়। নির্বাচিত সময়ের দুই মাস আগে চারা তৈরির জন্য বীজ বপন করতে হয়। দেড় থেকে দুইমাস বয়সের চারা রোপণ করা হয়। ২ মিটার দূরে দূরে ৬০ সেমি × ৬০ সেমি × ৬০ সেমি আকারের মাদা তৈরি করে চারা রোপণ করা হয়। রোপণের ১৫ দিন পূর্বে মাদার মাটিতে সার মেশাতে হয়।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : প্রতিটি মাদায় ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম, ২৫ গ্রাম বোরাক্স, ২০ গ্রাম জিংক সালফেট এবং ১৫ কেজি জৈব সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর গাছে নতুন পাতা এলে ইউরিয়া ও এমওপি সার ৫০ গ্রাম করে প্রতি এক মাস অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। গাছে ফুল এলে এ মাত্রা দ্বিগুণ করা হয়। শেষ ফল সংগ্রহের এক মাস পূর্বেও এমওপি ও ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা : একলিঙ্গ জাতের ক্ষেত্রে প্রতি মাদায় ৩টি চারা রোপণ করা হয়। ফুল এলে ১টি স্ত্রী গাছ রেখে বাকি গাছ তুলে ফেলতে হবে। পরাগায়নের সুবিধার জন্য বাগানে ১০% পুরুষ গাছ রাখা হয়। ফুল হতে ফল ধরা নিশ্চিত মনে হলে একটি বোঁটায় একটি ফল রেখে বাকিগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হয়। গাছ যাতে ঝড়ে না ভাঙে তার জন্য বাঁশের খুটি দিয়ে গাছ বেঁধে দিতে হবে।

রোগ–পোকা ও প্রতিকার : বীজতলা বা পলিব্যাগের মাটি স্যাঁতসেঁতে থাকলে চারার ঢলে পড়া এবং সুষ্ঠু নিকাশ ব্যবস্থার অভাবে বর্ষার সময় মাঠে বয়স্ক গাছে কান্ড পচা রোগ দেখা দিতে পারে। ছত্রাকজনিত এ

রোগ দমনের জন্য গাছের গোড়ায় পানি নিকাশের ভালো ব্যবস্থা রাখতে হয়, রোগাক্রান্ত চারা গাছ মাটি থেকে উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। পেঁপে গাছে মোজাইক ভাইরাস ও পাতা কোঁকড়ানো ভাইরাস রোগ দেখা দিতে পারে। মোজাইক রোগে পাতা হলদেভাব ও মোজাইকের মতো মনে হয়। এসব রোগে পাতার ফলক পুরু ও ভঙ্গুর হয়ে যায়। বাগানে কোনো গাছে ভাইরাস দেখা দিলে তা সাথে সাথে উপড়িয়ে পুঁতে ফেলতে হবে।

ফল সংগ্রহ : ফলের কষ জলীয়ভাব ধারণ করলে সবজি হিসেবে সংগ্রহ করা যায়। ফলের ত্বক হালকা হলদে বর্ণ ধারণ করলে পাকা ফল হিসেবে সংগ্রহ করা হয়। জাত ভেদে ফলনে পার্থক্য দেখা যায়। তবে শাহী পেঁপের ফলন প্রতি হেক্টরে ৪০–৫০ টন হয়।

কাজ : পেঁপের চারা উৎপাদন ও চারা রোপণ পদ্ধতি সম্পর্কে খাতায় লেখ এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : বোরাক্স সার, ভাইরাস রোগ, মাদা তৈরি

পাঠ–৭ : কৃষি হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি (ফসল উৎপাদন)

অনেক মানুষ ফসল উৎপাদনকে ব্যবসা হিসেবে নিয়ে থাকে। তাই ফসল উৎপাদনে ব্যয় এবং উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে আয়ের হিসাব করে থাকে। যদি কোনো ফসল উৎপাদনে ব্যয় থেকে আয় কাঙ্ক্ষিত মাত্রার বেশি হয় তবে সে ফসল উৎপাদনে যাওয়া উচিত। ফসল উৎপাদনে আয়–ব্যয়, স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে ভিন্ন হতে পারে। ফসল উৎপাদনে আয়–ব্যয়ের হিসাব করতে হলে আমাদের প্রথমে কত ধরনের ব্যয় ও আয় হতে পারে সে বিষয়ে জানতে হবে। ফসল উৎপাদনে আমরা তিন ধরনের ব্যয় দেখতে পাই; যথা–ক) উপকরণ ব্যয়, খ) উপরি ব্যয় এবং গ) মোট উৎপাদন ব্যয়।

ক) উপকরণ ব্যয় : উপকরণ ব্যয়কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা–

১. বস্তুগত উপকরণ ব্যয় : ফসল উৎপাদনে বীজ, সার, সেচ ইত্যাদির জন্য যে ব্যয় হয় তাকে বস্তুগত উপকরণ ব্যয় বলে। বস্তুগত উপকরণ ব্যয় নিচের ছকের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়–

ক্রমিক নং	উপকরণ	হেক্টর প্রতি প্রয়োজনীয় উপকরণ (কেজি)	উপকরণের মূল্য হার (টাকা)	হেক্টর প্রতি ব্যয় (টাকা)

২. অবস্তুগত উপকরণ ব্যয় : ফসল উৎপাদন কাজে প্রয়োজনীয় শ্রমিক ও পশু বা যান্ত্রিক শক্তির জন্য যে ব্যয় প্রয়োজন হয় তাকে অবস্তুগত ব্যয় বলে। যেমন– চারা রোপণের জন্য শ্রমিক, জমি চাষের জন্য খরচ ইত্যাদি। অবস্তুগত উপকরণ ব্যয় নিচের ছকের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়–

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	শ্রমিক সংখ্যা বা চাষ সংখ্যা	দৈনিক মজুরি বা চাষ প্রতি খরচ (টাকা)	হেক্টর প্রতি ব্যয় (টাকা)

খ) উপরি ব্যয় : ফসল উৎপাদন কালে মোট উপকরণ ব্যয়ের উপর সুদ ও জমির মূল্যের উপর সুদ।

গ) **মোট উৎপাদন ব্যয় :** মোট উপকরণ ব্যয় ও মোট উপরি ব্যয়ের যোগফলকে মোট উৎপাদন ব্যয় বলে।

মোট উৎপাদন ব্যয় = মোট উপকরণ ব্যয় + মোট উপরি ব্যয়।

ফসল উৎপাদনে আয়কে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়, যথা– সামগ্রিক আয় ও প্রকৃত আয়। উৎপাদিত ফসল ও উপদ্রব্য বিক্রি করে যে আয় হয় তাকে সামগ্রিক আয় বলে, যেমন– ধান চাষ করে উৎপাদিত ধান ও খড় বিক্রি করে প্রাপ্ত আয়। সামগ্রিক আয় থেকে মোট উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে যে আয় থাকে তাকে প্রকৃত আয় বলে।

প্রকৃত আয় = সামগ্রিক আয় – মোট উৎপাদন ব্যয়।

তোমরা কি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে পেঁপে চাষের জন্য প্রকৃত আয় বের করতে পারবে? পেঁপে চাষে প্রকৃত আয় বের করার জন্য নিচের ব্যয় ও আয়ের হিসাব আমাদের করতে হবে :

বস্তুগত উপকরণ ব্যয়

১. বীজ, সার, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, বাঁশ, সুতলি, পানি সেচ বাবদ খরচ বের করতে হবে।

অবস্তুগত উপকরণ ব্যয়

১. বীজতলা তৈরি, বীজ বপন, চারার পরিচর্যা, চারা তোলার শ্রমিকের সংখ্যা ও খরচ বের করতে হবে।
২. তিন বার জমি চাষ ও মই এর জন্য চাষের খরচ বের করতে হবে।
৩. মাদা তৈরি, সার মেশানো, চারা রোপণের জন্য শ্রমিকের সংখ্যা ও খরচ বের করতে হবে।
৪. সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচর্যা, ফসল সংগ্রহের জন্য খরচ বের করতে হবে।

উপরি ব্যয়

১. মোট উপকরণ ব্যয়ের উপর ১২.৫০% হারে ফসল উৎপাদনকালীন সময়ের সুদ বের করতে হবে।
২. জমির বাজার মূল্যের উপর ১২.৫০% হারে ফসল উৎপাদনকালীন সময়ের সুদ বের করতে হবে।

মোট উৎপাদন ব্যয় : মোট উপকরণ ব্যয় ও মোট উপরি ব্যয় যোগ করে মোট উৎপাদন ব্যয় বের করতে হবে।

সামগ্রিক আয় : সম্ভাব্য ফলনকে বাজারদর দিয়ে গুণ করে সামগ্রিক আয় বের করতে হবে।

প্রকৃত আয় : সামগ্রিক আয় থেকে মোট উৎপাদন ব্যয় বিয়োগ করে প্রকৃত আয় হিসাব করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে ১২০০ বর্গমিটার জমিতে পেঁপে চাষের জন্য আয়-ব্যয়ের হিসাব কর।

নতুন শব্দ : বস্তুগত উপকরণ ব্যয়, অবস্তুগত উপকরণ ব্যয়, উপরি ব্যয়, মোট উৎপাদন ব্যয়, সামগ্রিক আয়, প্রকৃত আয়

পাঠ-৮ : কৈ মাছ চাষ পদ্ধতি

কৈ মাছ একটি সুস্বাদু মাছ। বাংলাদেশের মানুষের কাছে এটি খুব জনপ্রিয়। আমাদের দেশে হাওর, খাল, বিল, ডোবায় কৈ মাছ পাওয়া যায়। এদেশে কৈ মাছের যে জাতটির চাষ হয় সেটি থাইল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত। থাই কৈ মাছ দেশি জাতের চেয়ে অধিক বর্ধনশীল। কৈ মাছ পানিতে অন্যান্য মাছের মতো ফুলকার সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ করে। কিন্তু পানির উপরে এলে এদের চামড়ার নিচে অবস্থিত একটি বিশেষ অঙ্গ দ্বারা প্রতিকূল পরিবেশে বাতাস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে বেঁচে থাকতে পারে। কৈ মাছের চাষ এখন লাভজনক।

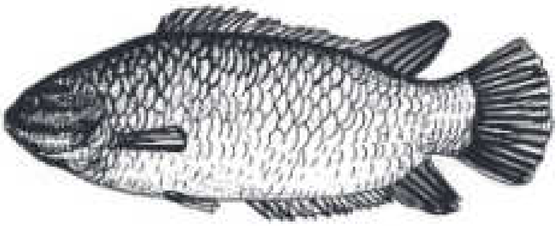

চিত্র-৫.১৩ : কৈ মাছ

কৈ মাছ চাষের গুরুত্ব : এ মাছ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে এবং বাজার মূল্যও বেশি। স্বল্প গভীরতার পুকুরে ও অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়। এ মাছ চাষ করে পারিবারিক প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটানো সম্ভব।

চাষযোগ্য পুকুরের বৈশিষ্ট্য : পুকুরটি খোলামেলা জায়গায় হবে। পলি দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ মাটিতে পুকুর হলে ভালো। পুকুর শক্ত ও পরিষ্কার পাড়যুক্ত এবং বন্যামুক্ত স্থানে হতে হবে। পুকুরে অন্তত ৫-৬ মাস পানি থাকতে হবে।

চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি : কৈ মাছের পুকুর প্রস্তুতির জন্য নিচের পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করতে হবে-

পাড় মেরামত : পুকুরের পাড় ভাঙা থাকলে সেটা ভালোভাবে মেরামত করতে হবে। পাড়ে বড় গাছপালা থাকলে সেগুলো ছেঁটে দিতে হবে যাতে পুকুরে পর্যাপ্ত আলো পড়ে।

জলজ আগাছা দমন : পুকুর হতে জলজ আগাছা পরিষ্কার করতে হবে যেন পুকুরে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পড়ে। তাছাড়া আগাছামুক্ত পুকুর মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরিতে সহায়তা করে।

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণ : পুকুর থেকে রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করতে হবে। কারণ রাক্ষুসে মাছ কৈ মাছের পোনা খেয়ে ফেলে। অবাঞ্ছিত মাছ কৈ মাছের খাদ্য খেয়ে ফেলে। বারবার জাল টেনে বা পুকুর শুকিয়ে বা প্রতি শতক পুকুরে ২০–৩০ গ্রাম রোটেনন প্রয়োগ করে এদের দূর করা যায়।

চুন প্রয়োগ : চুন প্রয়োগে পানি ও মাটির অম্লতা দূর হয়। চুন পানির ঘোলাত্ব দূর করে এবং কৈ মাছের রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। তাই প্রতি শতক পুকুরে ১–২ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগ : কৈ মাছের চাষ অনেকটা সম্পূরক খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। চুন প্রয়োগের ৭ দিন পর শতক প্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি পানিতে ভিজিয়ে সূর্যালোকের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

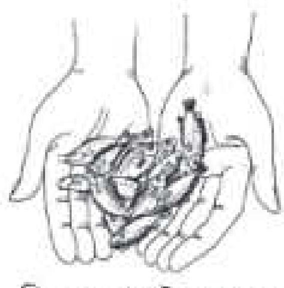

চিত্র-৫.১৪ : কৈ মাছের পোনা

পোনা ছাড়া : কৈ মাছ বৃষ্টির সময় কাত হয়ে কানে হেঁটে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে সক্ষম। সে জন্য কৈ মাছের পোনা ছাড়ার পূর্বে পুকুরের চারদিকে নাইলন নেট দিয়ে বেড়া দিতে হবে। পোনা পরিবহনের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন পোনা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। পুকুরে পোনা ছাড়ার পূর্বে অবশ্যই পোনাকে পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। প্রতি শতকে ৪০০–৫০০ পোনা মজুদ করা যাবে। এ রকম মজুদ ঘনত্বে অবশ্যই তৈরি খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

খাবার প্রদান : কৈ মাছকে খাবার হিসেবে ফিশমিল, সরিষার খৈল, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি পানি দ্বারা মিশ্রিত করে বল তৈরি করে পুকুরের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রদান করতে হবে। আবার বাজার থেকে বাণিজ্যিক খাদ্য কিনেও সরবরাহ করা যেতে পারে। প্রতিদিন মাছের দেহ ওজনের ৫% – ১০% হারে খাদ্য দিতে হবে। প্রতিদিন খাবার দুই ভাগ করে সকালে ও বিকালে দিতে হবে।

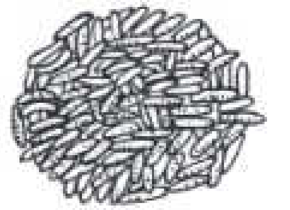

চিত্র-৫.১৫ : কৈ মাছের জন্য তৈরি খাদ্য

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কৈ মাছের চাষ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : প্রতিকূল পরিবেশ, সম্পূরক খাদ্য

পাঠ–৯ : কৈ মাছের রোগ ব্যবস্থাপনা

মাছের রোগ ব্যবস্থাপনা বলতে রোগের বিরুদ্ধে গৃহীত প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাকে বোঝায়। রোগ হওয়ার পূর্বে প্রতিরোধ এবং রোগ হওয়ার পর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কৈ মাছের রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসার থেকে প্রতিরোধের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এ মাছে প্রধানত ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবীজনিত রোগ বেশি হয়। তবে মাছের মজুদ ঘনত্ব বেশি ও খাদ্যে পুষ্টির অভাব হলে মাছ অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

নিচে কৈ মাছের রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ উল্লেখ করা হলো–

১। মাসে অন্তত একবার জাল টানতে হবে।

২। মাছের গড় ওজনের সাথে মিল রেখে পুকুরে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

৩। পানির রং গাঢ় সবুজ হলে বা পানি নষ্ট হলে পানি পরিবর্তন করতে হবে।

৪। পুকুরে লাল স্তর পড়লে প্রতি শতকে ৫০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করতে হবে।

৫। কৈ মাছের পুকুরে প্রচুর প্ল্যাংকটন তৈরি হয় যা পুকুরের পানির পরিবেশ নষ্ট করে। প্ল্যাংকটন নিয়ন্ত্রণের জন্য শতক প্রতি ১২টি তেলাপিয়া ও ৪টি সিলভার কার্পের পোনা ছাড়া যেতে পারে।

৬। পানিতে অক্সিজেনের অভাব হলে পুকুরে বাঁশ পিটিয়ে বা সাঁতার কেটে অক্সিজেন মেশানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। রোগ প্রতিরোধের জন্য শীতের শুরুতে ১ মিটার পানির গভীরতার জন্য শতক প্রতি ০.৫–১.০ কেজি হারে চুন বা ২০০–২৫০ গ্রাম জিওলাইট প্রয়োগ করতে হবে। আবার মাসে ২ বার করে প্রতি শতকে ২৫০ গ্রাম হারে লবণও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কাজ: শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে কৈ মাছের রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ আলোচনা করবে এবং খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পুকুরে কৈ মাছের রোগ দেখা দিলে নিম্নবর্ণিত চিকিৎসা বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়–

১। মাছে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ বা লেজ ও পাখনা পচা রোগ দেখা দিলে পুকুরে প্রতি শতকে ৬–৮ গ্রাম হারে কপার সালফেট প্রয়োগ করতে হবে।

২। মাছের শরীরে উকুন হলে পুকুরে ৩০ সেমি গভীরতার জন্য প্রতি শতকে ৩–৬ গ্রাম ডিপটারেক্স সপ্তাহে ১ বার হিসাবে পরপর ৩ বার প্রয়োগ করতে হবে।

কৈ মাছের লেজ ও পাখনা পচা রোগ

উকুনে আক্রান্ত একটি মাছ

চিত্র–৫.১৬: রোগাক্রান্ত কৈ মাছ

৩। মাছের ক্ষতরোগ হলে পুকুরে কপার সালফেট ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি প্রতি কেজি খাবারের সাথে ৩-৫ গ্রাম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন সাত দিন ব্যবহার করে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এছাড়াও পুকুরে ৩০ সেমি পানির গভীরতার জন্য প্রতি শতকে ০.৫-১.০ কেজি খাবার লবণ ব্যবহার করা যায়।

নতুন শব্দ : প্রতিকার ব্যবস্থা, পুকুরে লাল স্তর, লেজ ও পাখনা পচা রোগ, মাছের উকুন

পাঠ-১০ : মুরগি পালন পদ্ধতি

গ্রামে কীভাবে মুরগি পালন করা হয় তা নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ করেছ। গ্রাম-বাংলায় সম্পূর্ণ মুক্ত বা ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালন করা হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক খামারে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় মুরগি পালন করা হয়। আবার কেউ কেউ ঘেরাও করা জায়গার মধ্যে মুরগি পালন করে থাকে। নিচে মুরগি পালন পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো।

মুক্ত বা ছাড়া পদ্ধতিতে মুরগি পালন : এ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ মুক্ত বা খোলা অবস্থায় মুরগি পালন করা হয়। অল্প সংখ্যক মুরগি পালনে এ পদ্ধতি খুবই সহজ ও জনপ্রিয়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বাড়িতে বাড়িতে এ পদ্ধতিতে মুরগি পালন করা হয়। এ ক্ষেত্রে মুরগি সারাদিন বসতবাড়ির চারপাশে ঘুরে ফিরে নিজের খাদ্য নিজেই সংগ্রহ করে। এদেরকে বাড়ির উচ্ছিষ্ট খাবারও সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সন্ধ্যার সময় এরা নিজ বাসায় ফিরে আসে। এ ক্ষেত্রে বাসস্থানের জন্য তেমন খরচ হয় না। এ পদ্ধতিতে মুরগি পালনে খরচ কম। কারণ এখানে খাদ্য ও শ্রমিক লাগে না। বাণিজ্যিকভাবে মুরগি পালনে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। এ পদ্ধতিতে দেশি মুরগি পালন করা লাভজনক।

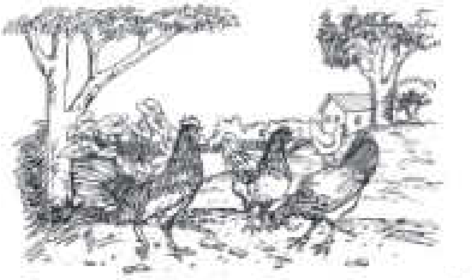

চিত্র-৫.১৭ : মুক্ত পদ্ধতিতে বাড়িতে মুরগি পালন

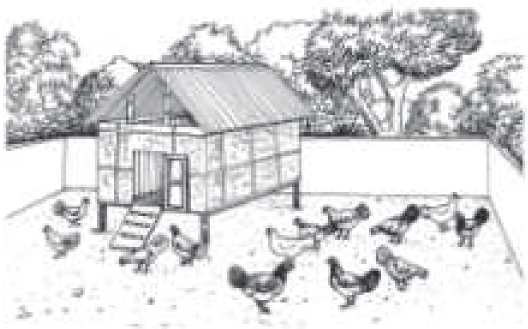

চিত্র-৫.১৮ : অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে মুরগি পালন

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে মুরগি পালন : এ পদ্ধতিতে মুরগির জন্য নির্দিষ্ট ঘর থাকে। মুরগির ঘরের চারদিকে বেড়া বা দেয়াল দিয়ে অনেকখানি জায়গা ঘেরাও করা হয়। একে রান বলে। মুরগি সারাদিন এ জায়গায় চরে বেড়ায়। ঝড় ও বৃষ্টির সময় মুরগি ঘরে গিয়ে উঠে। তাছাড়া রাতে এরা ঘরে আশ্রয় নেয়। নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে থাকায় তারা প্রয়োজনমতো খাদ্য ও পানি পায় না। তাই এখানেও এদেরকে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করতে হয়। খাদ্য সরবরাহের কারণে এ পদ্ধতিতে উৎপাদন খরচ বেশি হয়ে থাকে।

অর্ধ– আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাইব্রিড মুরগি পালন না করে উন্নত জাতের ফাইওমি, অস্ট্রালর্প বা রোড আইল্যান্ড রেড জাতের মুরগি পালন করাই ভালো।

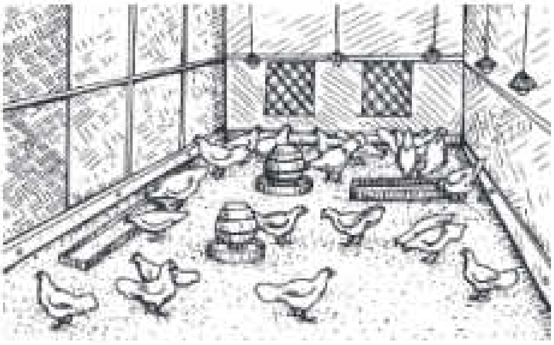

চিত্র–৫.১৯ : আবদ্ধ পদ্ধতিতে মেঝেতে মুরগি পালন

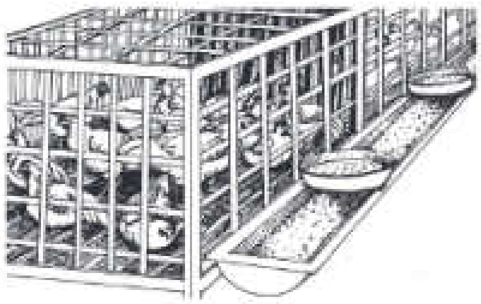

চিত্র–৫.২০ : আবদ্ধ পদ্ধতিতে খাঁচায় মুরগি পালন

কাজ : শিক্ষার্থীরা তিন ভাগ হয়ে দলগতভাবে মুরগি পালনের বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

আবদ্ধ পদ্ধতিতে মুরগি পালন : এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় অনেক মুরগি ঘরের মধ্যে পালন করা হয়। এখানে ঘরকে মুরগি পালন উপযোগী করে নির্মাণ করা হয়। একে মুরগির খামার বলে। সাধারণত আবদ্ধ পদ্ধতিতে মেঝেতে মুরগি পালন করা হয়। আবার অনেকে খাঁচায়ও মুরগি পালন করে থাকে। ঘরের মেঝে সেঁতসেঁতে হলে মাচায় মুরগি পালন করা যায়। বাণিজ্যিক মুরগি পালনে এ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ পদ্ধতিতে মুরগিকে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা হয়। তাই এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা খরচ বেশি এবং লাভও বেশি। উন্নত জাতের ডিম পাড়া মুরগি, ব্রয়লার ও লেয়ার হাইব্রিড মুরগি আবদ্ধ পদ্ধতিতে পালন করা হয়। এ ক্ষেত্রে অল্প জায়গায় একসাথে অনেক বেশি মুরগি পালন করা যায়।

নতুন শব্দ : বাণিজ্যিক, উচ্ছিষ্ট , ব্যবস্থাপনা, হাইব্রিড, ব্রয়লার ও লেয়ার

পাঠ–১১ : মুরগির খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা

মুরগির খাদ্য ব্যবস্থাপনাই হচ্ছে অন্যতম প্রধান বিষয়। বসতবাড়িতে মুক্ত বা ছাড়া পদ্ধতিতে পালন করা মুরগি খাবারের বর্জ্য, ঝরা শস্য, পোকামাকড়, শাকসবজি ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে। তাই এরা পরিমিত ও সুষম খাবার পায় না। বসতবাড়িতে উন্নত জাতের মুরগি পালন করলে সুষম খাদ্য না দেওয়া হলে প্রত্যাশিত ডিম ও মাংস পাওয়া যাবে না। খামারে মুরগি পালনে মোট ব্যয়ের ৭০% খাদ্য বাবদ খরচ হয়। মুরগি প্রচুর পরিমাণ পানি পান করে। তাই মুরগির খামারে খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ।

মুরগির পুষ্টি ও খাদ্য উপকরণ : মুরগির দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানগুলো হচ্ছে শর্করা, আমিষ, স্নেহ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও পানি। সুষম খাবারে মুরগির দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো উপস্থিত থাকে। মুরগির পুষ্টির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের তালিকা নিচে দেওয়া হলো–

ক্রমিক নং	পুষ্টি উপাদান	খাদ্য উপকরণ
১	শর্করা	গম, ভুট্টা, চালের খুদ, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি ইত্যাদি
২	আমিষ	শুঁটকি মাছের গুঁড়া, সয়াবিন মিল, তিলের খৈল, সরিষার খৈল ইত্যাদি
৩	স্নেহ	সয়াবিন তেল, সরিষার তেল, তিলের তেল ইত্যাদি
৪	খনিজ	খাদ্য লবণ, হাড়ের গুঁড়া, ঝিনুক ও শামুকের গুঁড়া, ভিটামিন–খনিজ মিশ্রণ
৫	ভিটামিন	শাক–সবজি, ভিটামিন মিশ্রণ ইত্যাদি
৬	পানি	টিউবওয়েল ও কূপের বিশুদ্ধ পানি

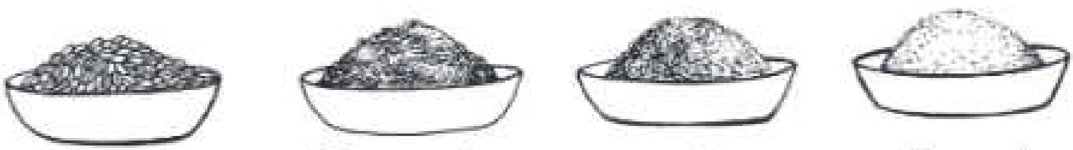

চিত্র- ৫.২১: বিভিন্ন প্রকার খাদ্য উপকরণ

মুরগির রেশন : বাজারে বাণিজ্যিকভাবে মুরগির জন্য ৩ ধরনের খাদ্য পাওয়া যায়। লেয়ার মুরগির জন্য বাচ্চার রেশন, বাড়ন্ত মুরগির রেশন ও ডিম পাড়া মুরগির রেশন পাওয়া যায়। ব্রয়লার মুরগির জন্য বাচ্চার রেশন, বাড়ন্ত ব্রয়লার রেশন ও ফিনিশার রেশন পাওয়া যায়। তাই মুরগির বয়স ও উদ্দেশ্য অনুসারে রেশন তৈরি করে বা বাজার থেকে কিনে মুরগিকে খাওয়াতে হবে।

মুরগির রেশন তৈরি : দানাদার খাদ্য উপকরণ দিয়ে মুরগির সুষম রেশন তৈরি করা হয়। রেশন তৈরির সময় প্রায় ৪৫–৫৫% গম ও ভুট্টা ভাঙা, চালের কুঁড়া ও গমের ভুসি ১৫–২০%, সয়াবিন মিল ও তিলের খৈল ১০–১৫%, শুঁটকি মাছের গুঁড়া ৬–১০%, হাড়ের গুঁড়া বা ঝিনুক–শামুকের গুঁড়া ২–৬% ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া রেশনে খাদ্য লবণ, ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ যোগ করতে হয়। রেশন তৈরির পর খাদ্য উপকরণ ভালোভাবে মিশ্রিত করতে হয়।

নিচে ডিম পাড়া মুরগির রেশন তৈরির একটি নমুনা দেওয়া হলো–

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণ	শতকরা হার (%)
১	গম ভাঙা ও ভুট্টা ভাঙা	৪৭.০০
২	গমের ভুসি ও চালের কুঁড়া	১৬.০০
৩	সয়াবিন মিল	১০.০০
৪	তিলের খৈল	১০.০০
৫	শুঁটকি মাছের গুঁড়া	১০.০০
৬	ঝিনুক-শামুকের গুঁড়া	৬.০০
৭	খাদ্য লবণ	০.৫০
৮	ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ	০.৫০
	মোট	১০০.০০

কাজ : শিক্ষার্থীরা ভাগ হয়ে দলগতভাবে নির্দেশিত অনুপাত ঠিক রেখে রেশন তৈরির নমুনা অনুসরণ করে দুই কেজি রেশন তৈরি করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

খাদ্য ও পানি সরবরাহ : প্রতিটি বাচ্চা মুরগি দিনে ১০-১৫ গ্রাম খাদ্য খায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়স্ক মুরগিকে দৈনিক প্রায় ১০০-১২০ গ্রাম খাদ্য এবং ২০০ মিলিলিটার জীবাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানি দিতে হয়। প্রতিদিন খাদ্যের পাত্র ও পানির পাত্র পরিষ্কার করে ব্যবহার করতে হবে।

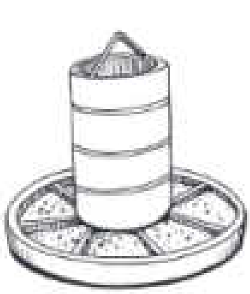

খাদ্য পাত্র

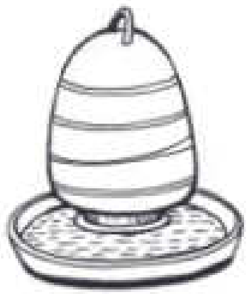

পানির পাত্র

চিত্র-৫.২২: মুরগির খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র

নতুন শব্দ : রেশন, ফিনিশার রেশন

পাঠ–১২ : মুরগির রোগ ব্যবস্থাপনা

মানুষের মতো পাখিদেরও বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। মানুষ ও পশুপাখির স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের বিচ্যুতিকে রোগ বলা হয়। শরীরের অস্বাভাবিক লক্ষণকে রোগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। রোগ ব্যবস্থাপনা বলতে এর প্রতিরোধ, রোগ নির্ণয় ও প্রতিকারকে বোঝায়। প্রাথমিকভাবে বাহ্যিক লক্ষণ দেখে অসুস্থ মুরগি শনাক্ত করা যায়। নিচে একটি অসুস্থ মুরগির লক্ষণ দেওয়া হলো–

১। অসুস্থ মুরগি দল থেকে আলাদা হয়ে যায়।

২। মাটিতে বসে ঝিমাতে থাকে।

৩। খাদ্য ও পানি গ্রহণ কমে যায় বা ত্যাগ করে।

৪। মুরগির গায়ের পালকগুলো উসকো খুশকো দেখায়।

৫। পায়খানা স্বাভাবিক হয় না।

চিত্র- ৫.২৩: একটি অসুস্থ মুরগির বাহ্যিক লক্ষণ

বিভিন্ন কারণে পাখির রোগ হয়ে থাকে। রোগের প্রধান কারণ জীবাণু। মুরগির ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ খুবই মারাত্মক। ভাইরাসজনিত রোগের চিকিৎসা নেই। তাই রোগ দেখা দিলে মুরগিকে আর বাঁচানো যায় না। তাছাড়া পরজীবীজনিত রোগ মুরগির অনেক ক্ষতি করে থাকে। মুরগির ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত টিকা প্রদান করতে হবে। টিকা দেওয়ার পর ঐ রোগের বিরুদ্ধে মুরগির শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে। তাই বাড়ির বা খামারের সকল সুস্থ মুরগিকে একসাথে টিকা দিতে হয়। নিচে মুরগির কতগুলো রোগের নাম দেওয়া হলো–

১। **ভাইরাসজনিত রোগ :** রাণীক্ষেত, গামবোরো, বার্ড ফ্লু ইত্যাদি

২। **ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ :** ফাউয়েল কলেরা, ফাউয়েল টাইফয়েড, পুলোরাম, যক্ষা, বটুলিজম ইত্যাদি

৩। **পরজীবীজনিত রোগ :** মুরগির দেহের ভিতরে ও বাইরে দুই ধরনের পরজীবী দেখা যায়। দেহের বাইরে পালকের নিচে উকুন, আটালি ও মাইট হয়ে থাকে। দেহের ভিতরে গোল কৃমি ও ফিতা কৃমি দ্বারা মুরগি বেশি আক্রান্ত হয়। এরা মুরগির গৃহীত পুষ্টিকর খাদ্যে ভাগ বসায়। অনেক কৃমি মুরগির শরীর থেকে রক্ত চুষে নেয়। তাছাড়া প্রায়ই মুরগির রক্ত আমাশয় হতে দেখা যায়। এ রোগটি প্রোটোজোয়া দ্বারা হয়ে থাকে।

চিত্র -৫.২৪ : একটি অসুস্থ মুরগির চিকিৎসা

গৃহপালিত পশু দীর্ঘদিন খামারে থাকে। তাই রোগ হলে এদের চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ করে পুনরায় উৎপাদনে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু বাণিজ্যিক মুরগির খামারে এটা সম্ভব হয় না। তাই মুরগির খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কিছু পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে।

পদক্ষেপসমূহ—

১। মুরগির ঘর ও এর চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা

২। মুরগির খামারে বন্য পশুপাখিকে ঢুকতে না দেওয়া

৩। মুরগিকে সময়মতো টিকা দেওয়া

৪। মুরগিকে তাজা খাদ্য খেতে দেওয়া

৫। মুরগিকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা

৬। মুরগিকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করা

৭। মুরগির বিছানা শুষ্ক রাখার ব্যবস্থা করা

৮। মুরগির বিষ্ঠা খামার থেকে দূরে সংরক্ষণ করা

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে মুরগির সাধারণত কী কী ধরনের রোগ হয় তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

মুরগির খামারে রোগ দেখা দিলে আতঙ্কিত না হয়ে প্রথমে একজন পশুচিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে অতি দ্রুত নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত–

১। অসুস্থ পাখিকে আলাদা করে পর্যবেক্ষণ করা

২। প্রয়োজন হলে পাখির মলমূত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করা

৩। মারাত্মক ভাইরাস রোগ হলে সকল মুরগিকে ধ্বংস করা

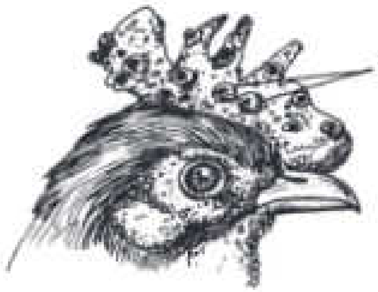

চিত্র-৫.২৫ : ফাউয়েল পক্স রোগে আক্রান্ত মুরগি

৪। মৃত মুরগিকে মাটির নিচে চাপা দেওয়া

৫। রোগাক্রান্ত মুরগি বাজারে বিক্রি না করা

৬। পশু ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে মুরগিকে চিকিৎসা দেওয়া

নতুন শব্দ : ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, পরজীবী, প্রতিরোধ, প্রোটোজোয়া

পাঠ–১৩ : ছাগল পালন পদ্ধতি

বাংলাদেশে ছাগল অন্যতম গৃহপালিত পশু। ছাগী ৭–৮ মাসের মধ্যে বাচ্চা ধারণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। এরা একসাথে ২–৩টি বাচ্চা দেওয়ার কারণে কৃষকের নিকট খুব জনপ্রিয়। একটি ছাগল খাসি ১২–১৫ মাসের মধ্যে ১৫–২০ কেজি হয়ে থাকে। ছাগলের মাংস খুব সুস্বাদু। তাই বাজারে এ ছাগলের অনেক চাহিদা রয়েছে।

২০২৫

প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাগল পালন : গ্রামে ছাগলকে মাঠে, বাগানে, রাস্তার পাশে বেঁধে বা ছেড়ে দিয়ে পালন করা হয়। সাধারণত ছাগলকে বাড়ি থেকে কোনো বাড়তি খাদ্য সরবরাহ করা হয় না। কৃষক বর্ষাকালে বিভিন্ন গাছের পাতা কেটে ছাগলকে খেতে দেয়। রাতে ছাগলকে নিজেদের থাকার ঘর বা অন্য কোনো ঘরে আশ্রয় দেয়।

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ছাগল পালনের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এতে ছাগলের বাসস্থান, খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবদ্ধ ও অর্ধ–আবদ্ধ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করা হয়। যাদের চারণভূমি বা বাঁধার জন্য কোনো জমি নেই সেখানে আবদ্ধ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করা হয়।

আবদ্ধ পদ্ধতিতে ছাগল পালন : এখানে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় ছাগল পালন করা হয়। ছাগলের ঘরের জন্য উঁচু ও শুকনা জায়গা নির্বাচন করতে হয়। এ পদ্ধতিতে ঘর তৈরি করার জন্য কাঠ, বাঁশ, টিন, ছন, গোলপাতা ব্যবহার করে কম খরচে ঘর তৈরি করা যায়। ঘর তৈরি করার সময় প্রতিটি বয়স্ক ছাগলের জন্য ১ বর্গমিটার (১০ বর্গফুট) জায়গার প্রয়োজন হবে। মেঝে সৈতসৈতে হলে ছাগলের ঘরে মাচা তৈরি করে দিতে হবে। এখানে ছাগলকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাস, দানাদার খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা হয়। তবে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য ঘরের বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে এলে এদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। নতুন ছাগল দিয়ে খামার শুরু করলে প্রথমেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখা যাবে না। আস্তে আস্তে এদের চারণ সময় কমিয়ে আনতে হবে। নতুন পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত হলে খাদ্য গ্রহণে আর সমস্যা দেখা দিবে না।

চিত্র৫.২৬ : আবদ্ধ পদ্ধতিতে ছাগলের ঘর

চিত্র-৫.২৭ : আবদ্ধ পদ্ধতিতে ছাগলের খাদ্য গ্রহণ

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে ছাগল পালন : এ পদ্ধতিতে ছাগল পালনের সময় আবদ্ধ ও ছাড়া পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। খামারে আবদ্ধ অবস্থায় এদের দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয়। মাঠে চারণের মাধ্যমে এরা সবুজ ঘাস খেয়ে থাকে। বর্ষার সময় মাঠে নেওয়া সম্ভব না হলে সবুজ ঘাসও আবদ্ধ অবস্থায় সরবরাহ করতে হবে।

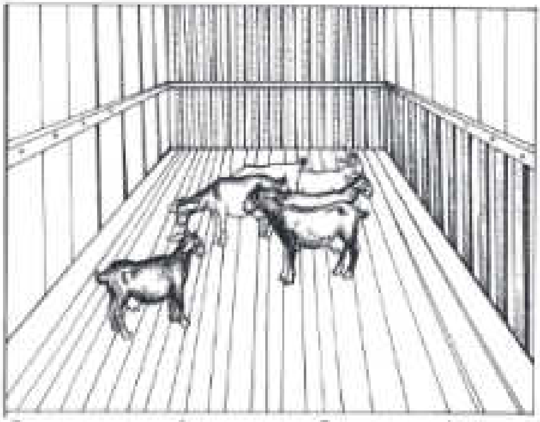

চিত্র-৫.২৮ : অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে মাচার উপর ছাগলের ঘর

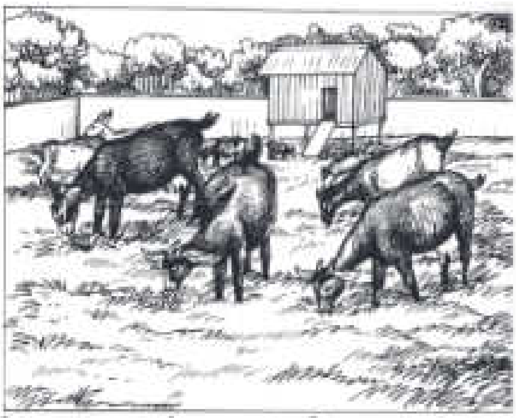

চিত্র-৫.২৯ : অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতে ছাগলের খাদ্য গ্রহণ

কাজ : শিক্ষার্থীরা ভাগ হয়ে দলগতভাবে ছাগল পালনের বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনার মাধ্যমে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : আবদ্ধ, অর্ধ-আবদ্ধ, দানাদার খাদ্য

পাঠ -১৪ : ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাই হচ্ছে অন্যতম প্রধান বিষয়। ছাগল সবুজ ঘাস ও দানাদার খাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করে। তাছাড়া চিকন ধানের খড় খুব ছোট করে কেটে চিটাগুড় মিশিয়েও ছাগলকে খাওয়ানো যায়। খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রথমেই ছাগলছানার কথা ভাবতে হবে। ছাগল ছানা ২-৩ মাসের মধ্যে মায়ের দুধ ছাড়ে। বাচ্চার বয়স ১ মাস পার হলে উন্নত মানের কচি সবুজ ঘাস ও দানাদার খাদ্যের অভ্যাস করাতে হবে।

সবুজ ঘাস : ছাগলের জন্য ইপিল ইপিল, কাঁঠাল পাতা, খেসারি, মাষকলাই, দূর্বা, বাকসা ইত্যাদি ঘাস বেশ পুষ্টিকর। দেশি ঘাসের প্রাপ্যতা কম হলে ছাগলের জন্য উন্নত জাতের নেপিয়ার, পারা, জার্মান ঘাস চাষ করা যায়। চাষ করা ঘাস কেটে বা চরিয়ে ছাগলকে খাওয়ানো যায়।

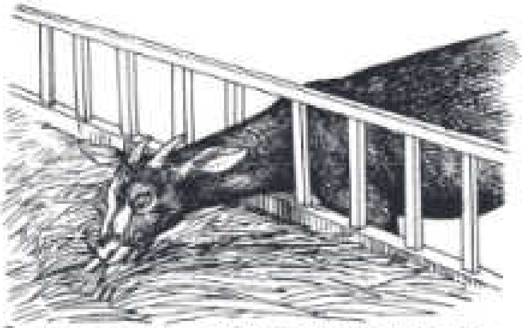

চিত্র-৫.৩০ : ছাগল কেটে দেওয়া সবুজ ঘাস খাচ্ছে

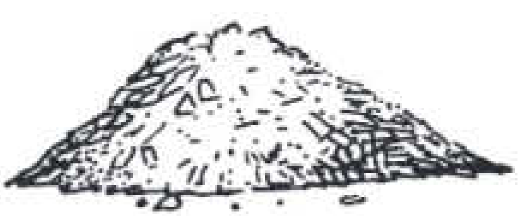

চিত্র-৫.৩১ : ছাগলের জন্য তৈরি দানাদার খাদ্য

দানাদার খাদ্য : ছাগলের পুষ্টি চাহিদা মিটানোর জন্য সবুজ ঘাসের সাথে দৈনিক চাহিদামতো দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। গম, ভুট্টা, গমের ভুসি, চালের কুঁড়া, বিভিন্ন ডালের খোসা, খৈল, শুঁটকি মাছের গুঁড়া ইত্যাদি দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দানাদার খাদ্যের সাথে খাদ্য লবণ ও ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ যোগ করতে হয়। বয়সভেদে ছাগলকে দৈনিক ১-২ লিটার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হয়।

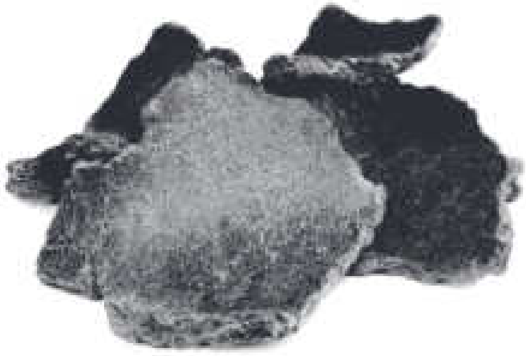

সরিষার খৈল

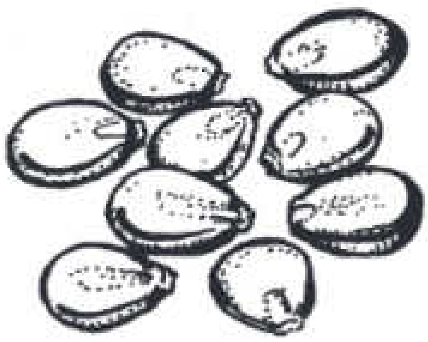

ভুট্টা

চিত্র- ৫.৩২ : সরিষার খৈল ও ভুট্টা

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে যেকোনো একটি কাজ সম্পাদন করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

১। তোমাদের গ্রামে ছাগল সবুজ ঘাস ও যেসব লতা পাতা খায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

২। দানাদার খাদ্য হিসেবে ছাগলকে যেসব খাদ্য সরবরাহ করা হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পানি : মানুষের মতো সকল পশুপাখির পানির প্রয়োজন রয়েছে। বয়সভেদে ছাগলকে দৈনিক ১-২ লিটার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হয়। তাই পানি ছাগলের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে।

ছাগলের জন্য দানাদার খাদ্যের একটি মিশ্রণ নিচে দেওয়া হলো-

খাদ্য উপাদান	শতকরা হার (%)
গম ভাঙা/ভুট্টা ভাঙা	১০
গমের ভুসি/চালের কুঁড়া	৪৮
ডালের ভুসি	১৭
সয়াবিন খৈল/সরিষার খৈল/তিলের খৈল	২০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	১.৫
হাড়ের গুঁড়া	২
খাদ্য লবণ	১
ভিটামিন–খনিজ মিশ্রণ	০.৫
মোট	১০০

ছাগলের ওজন অনুসারে সরবরাহের জন্য সবুজ ঘাস ও দানাদার খাদ্যের পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো–

ছাগলের ওজন (কেজি)	দৈনিক সবুজ ঘাস (কেজি)	দৈনিক দানাদার খাদ্য মিশ্রণ (গ্রাম)
৪	০.৪	১০০
৬	০.৬	১৫০
৮	০.৮	২০০
১০	১.৫	২৫০
১২	২.০	৩০০
১৪	২.৫	৩৫০

নতুন শব্দ : ভিটামিন–খনিজ মিশ্রণ

পাঠ – ১৫ : ছাগলের রোগ দমন

ছাগল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে। এদের বাসস্থানে আলো–বাতাসের ব্যবস্থা করতে হয়। ছাগল সবসময় শুকনা ও উঁচুস্থান খুব ভালোবাসে। ছাগলের যাতে ঠান্ডা না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ ঠান্ডায় এরা নিউমোনিয়াসহ অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। তাই শীতের সময় মেঝেতে ধানের খড় অথবা নাড়া বিছিয়ে দিতে হয়। শীতের সময় ছাগলকে ঠান্ডা থেকে রক্ষার জন্য

এদের ঘরের দেয়ালে প্রয়োজনে চটের বস্তা টেনে দিতে হবে। নিচে ছাগলের রোগের কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো–

১। ভাইরাসজনিত রোগ : পি.পি.আর, নিউমোনিয়া ইত্যাদি

২। ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ : গলাফুলা, ডায়রিয়া ইত্যাদি

৩। পরজীবীজনিত রোগ : ছাগলের দেহের ভিতরে ও বাইরে দুই ধরনের পরজীবী দেখা যায়। দেহের বাইরে চামড়ার মধ্যে উকুন, আটালি ও মাইট হয়ে থাকে। দেহের ভিতরে গোলকৃমি, ফিতাকৃমি ও পাতাকৃমি দ্বারা ছাগল বেশি আক্রান্ত হয়। এরা ছাগলের গৃহীত পুষ্টিকর খাদ্যে ভাগ বসায়। অনেক কৃমি ছাগলের শরীর থেকে রক্ত চুষে নেয়।

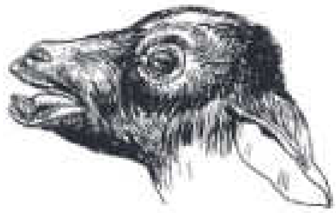

চিত্র-৫.৩৩ : পি.পি.আর রোগে আক্রান্ত একটি ছাগল

তাছাড়া প্রায়ই ছাগলের রক্ত আমাশয় হতে দেখা যায়। এ রোগটি প্রোটোজোয়া দ্বারা হয়ে থাকে। ছাগল মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হলে নিম্নলিখিত সাধারণ লক্ষণসমূহ দেখা যায়–

১। শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
২। চামড়ার লোম খাড়া দেখায়।
৩। খাদ্য গ্রহণ ও জাবর কাটা বন্ধ হয়ে যায়।
৪। ঝিমাতে থাকে ও মাটিতে শুয়ে পড়ে।
৫। চোখ দিয়ে পানি ও মুখ দিয়ে লালা নির্গত হয়।

চিত্র-৫.৩৪ : একটি অসুস্থ ছাগল

ছাগল ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যু হতে পারে। ভাইরাস রোগে আক্রান্ত পশুর চিকিৎসা করে সুফল পাওয়া যায় না। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত রোগেও ছাগলের মৃত্যু হয়ে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা করে অনেক ক্ষেত্রেই সুস্থ করে তোলা যায়। ছাগলের রোগ প্রতিরোধের জন্য ছাগলের খামারে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করতে হবে–

১। ছাগলের ঘর ও এর চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা।
২। ছাগলকে সময়মতো টিকা দেওয়া ও কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো।
৩। ছাগলকে তাজা খাদ্য খেতে দেওয়া।
৪। ছাগলকে সুষম খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা।
৫। ছাগলের ঘরের মেঝে শুষ্ক রাখার ব্যবস্থা করা।
৬। ছাগলের বিষ্ঠা খামার থেকে দূরে সংরক্ষণ করা।

চিত্র-৫.৩৫ : একটি সুস্থ ছাগলকে টিকা দেওয়া হচ্ছে

ছাগলের খামারে রোগ দেখা দিলে পশুচিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে–

১। অসুস্থ ছাগলকে আলাদা করে পর্যবেক্ষণ করা ও চিকিৎসা দেওয়া।
২। প্রয়োজনে ছাগলের মলমূত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা।
৩। মৃত ছাগলকে মাটির নিচে চাপা দেওয়া।

কাজ : শিক্ষার্থীরা চার দলে ভাগ হয়ে ছাগলের কী কী রোগ হয় সে সম্পর্কে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : কৃমিনাশক

পাঠ–১৬ : কৃষি হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি (মুরগি পালন)

পারিবারিকভাবে মুরগি পালন করলে নিজেদের খাবার ডিম ও মাংসের চাহিদা মেটে। তাছাড়া অতিরিক্ত ডিম বাজারে বিক্রি করে কিছু আয় করাও সম্ভব। নিচে ১০০টি ডিমপাড়া মুরগি পালনের আনুমানিক আয়–ব্যয় হিসাব করার একটি নমুনা দেওয়া হলো।

মুরগি পালনের ব্যয়ের খাত ২টি–
ক। স্থায়ী খরচ
খ। চলমান খরচ

ক) স্থায়ী খরচ : মুরগির খামার আরম্ভ করার আগে যে সমস্ত খরচ হয় তাকে স্থায়ী খরচ বলে। স্থায়ী খরচের মধ্যে জমি, মুরগির ঘর, ব্রুডার যন্ত্র, খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র, ড্রাম ও বালতি, ডিম পাড়ার বাক্স ইত্যাদি খাতসমূহ উল্লেখযোগ্য। নিচে ১০০টি ডিমপাড়া মুরগি পালনের আনুমানিক ব্যয় হিসাব করার একটি ছক দেওয়া হলো।

জমি	মুরগির ঘর তৈরি	ব্রুডার যন্ত্র	খাদ্য ও পানির পাত্র	ড্রাম ও বালতি	ডিম পাড়ার বাক্স	মোট স্থায়ী খরচ
নিজ	১৫,০০০/–	২,০০০/–	২,০০০/–	১,০০০/–	২,০০০/–	২২,০০০/–

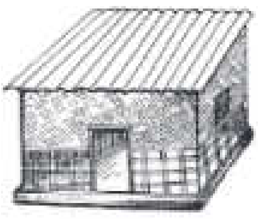
চিত্র-৫.৩৬ : একচালা মুরগির ঘর

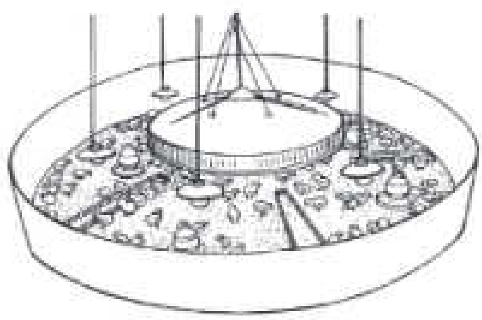
চিত্র-৫.৩৭ : ব্রুডার

খ) চলমান খরচ : খামারে বাচ্চা ক্রয় থেকে শুরু করে দৈনন্দিন যে সব খরচ হয় তাকে চলমান খরচ বলে। বাচ্চা পালনকালে শেষ পর্যন্ত ১০০টির মধ্যে আনুমানিক ১২টির মৃত্যু হয়। তাই কেনার সময় ১১২টি বাচ্চা ক্রয় করতে হয়। চলমান খরচের মধ্যে বাচ্চার দাম, খাদ্য ক্রয়, বিদ্যুৎ খরচ, টিকা ও ঔষধ, লিটার (মুরগির বিছানা), শ্রমিক ও পরিবহন খরচ উল্লেখযোগ্য। ডিমপাড়া মুরগি মোট ১৮ মাস খামারে থাকে। পারিবারিক খামারে ১০০টি ডিমপাড়া মুরগি পালনের চলমান আনুমানিক খরচ হিসাব করার একটি ছক দেওয়া হলো।

বাচ্চার দাম (প্রতিটি ৪০/-)	খাদ্য ক্রয় (প্রতিটি ৫০ কেজি করে ১০০ বস্তা প্রতি কেজি ৩৫/-)	বিদ্যুৎ খরচ (মাসিক ৩০০/-)	টিকা ও ঔষধ	লিটার	শ্রমিক	পরিবহন খরচ	মোট চলমান খরচ
৪,৪৮০/-	১,৭৫,০০০/-	৫,৪০০/-	২,০০০/-	১,০০০/-	নিজ	১,০০০/-	১,৮৮,৮৮০/-

মোট ব্যয় = মোট স্থায়ী খরচ + মোট চলমান খরচ=২২,০০০/-+ ১,৮৮,৮৮০/- =২,১০,৮৮০/-

আয় : ডিমপাড়া মুরগির খামারে ডিম, বয়স্ক মুরগি, লিটার ও খাদ্যের বস্তা বিক্রি করে আয় করা যায়। ডিম পাড়া শেষে প্রতিটি বয়স্ক মুরগি বাজারে বিক্রি করা যায়। তাছাড়া লিটার জৈব সার হিসেবে জমিতে এবং মাছের খাদ্য তৈরিতে পুকুরে ব্যবহার করা যায়। নিচে পারিবারিক খামারে ১০০টি ডিমপাড়া মুরগি থেকে আনুমানিক আয় হিসাব করার একটি ছক দেওয়া হলো।

ডিম বিক্রি (দৈনিক ৮০টি, ৫২ সপ্তাহ, ৮/- প্রতিটি)	মুরগি বিক্রি (প্রতিটি ২০০/-)	লিটার বিক্রি	খাদ্যের বস্তা বিক্রি (বস্তা ১০০টি, প্রতিটি ১০/-)	মোট আয়
২,৩২,৯৬০/-	২০,০০০/-	৫০০/-	১০০০/-	২,৫৪,৪৬০/-

মোট লাভ = মোট আয় - মোট ব্যয়=২,৫৪,৪৬০.০০ - ২,১০,৮৮০.০০ =৪৩,৫৮০/- টাকা

উল্লিখিত হিসাব অনুসারে দেখা যাচ্ছে প্রথম বছরেই স্থায়ী খরচ বাদ দিয়ে মোট ৪৩,৫৮০/- টাকা লাভ হয়েছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা এককভাবে ১০টি মুরগি পালনের আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখে জমা দিবে।

নতুন শব্দ : স্থায়ী খরচ, চলমান খরচ, লিটার

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বাংলাদেশে .... চাষ বাড়ছে।

২. পেয়ারা .... এর একটি প্রধান উৎস।

৩. রজনীগন্ধার জমিতে সবসময় পর্যাপ্ত .... থাকা দরকার।

৪. .... একটু বেশি রাখলে ফুল বেশি সময় সতেজ থাকে।

মিল করণ

	বামপাশ	ডানপাশ
১.	বীজ, সার, কীটনাশক	পেঁপের জাত
২.	শ্রমিক খরচ, চাষের খরচ	পেয়ারার জাত
৩.	কাঞ্চন নগর, স্বরূপকাঠি	অবস্তুগত উপকরণ ব্যয়
৪.	শাহী, রাঁচি, পুষা	বস্তুগত উপকরণ
		পশু খাদ্য

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. উপরি ব্যয় কী?

খ. ভুট্টার ব্যবহার উল্লেখ কর।

গ. ভুট্টা ফসলে রোগ দমনের জন্য কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে?

ঘ. রজনীগন্ধা ফুল কীভাবে মাঠ থেকে সংগ্রহ করে বাজারে পাঠানো হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

ক. ভুট্টার বিভিন্ন রোগ ও এর ব্যবস্থাপনা বর্ণনা কর।

খ. কৈ মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর প্রস্তুতি, রাক্ষুসে মাছ অপসারণ, চুন প্রয়োগ ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

গ. মুরগির খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কী কী পদক্ষেপ অনুসরণ করা উচিত?

ঘ. ছাগলের রোগের কারণসমূহ উল্লেখ কর এবং রোগাক্রান্ত ছাগলের লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর।

ঙ. ১০০টি ডিমপাড়া মুরগি পালনের আয়-ব্যয় হিসাব করার সংক্ষিপ্ত নমুনা বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **ভুট্টার উচ্চ ফলনশীল জাত কোনটি?**

ক. মুকুন্দপুরী খ. মোহর

গ. পুষা ঘ. রাঁচি

২. **ঔষধি গুণ–সম্পন্ন উদ্ভিদ–**

i. পেঁপে ও গাঁদা

ii. পেঁপে ও পেয়ারা

iii. ভুট্টা ও রজনীগন্ধা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

কমল দত্ত ২.৫ হেক্টর জমিতে বারি জাতের ভুট্টা চাষ করেন। তিনি জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে হেক্টর প্রতি ১৭২ কেজি হারে ইউরিয়া এবং পরিমিত মাত্রায় অন্যান্য সার প্রয়োগ করেন। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭৫ সেমি ঠিক করে ২৫ সেমি দূরত্বে তিনি বীজ বপন করেন। কিন্তু তিনি আশানুরূপ ফলন পেতে ব্যর্থ হন।

৩. **কমল দত্তের জমির জন্য প্রয়োজনীয় ইউরিয়া সারের পরিমাণ কত?**

ক. ৩৪৪ কেজি খ. ৪৩০ কেজি

গ. ৩১২ কেজি ঘ. ৮৬০ কেজি

৪. **কমল দত্তের ভালো ফলন না পাওয়ার কারণ কী?**

ক. ইউরিয়া কিস্তিতে প্রয়োগ না করা খ. বপন দূরত্ব সঠিক না হওয়া

গ. সঠিক মাত্রায় ইউরিয়া প্রয়োগ না করা ঘ. সঠিক জাত নির্বাচনে ব্যর্থ হওয়া

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দরিদ্র কৃষক পরিবারের মেয়ে আবিদা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুরগি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ লক্ষ্যে সে ১০টি দেশি ডিমপাড়া মুরগি কিনে আনে এবং বাড়ির মুক্ত পরিবেশে পালন শুরু করে। কিছু দিনের মধ্যেই মুরগিগুলো ডিম দিতে শুরু করে এবং আবিদার পরিবারে সচ্ছলতা আসে। আবিদার প্রতিবেশী শিউলিও তার দেখাদেখি মুরগি পালনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ২০টি ফাইওমি জাতের মুরগি ক্রয় করে এবং আবিদার মতো করে মুরগি পালন শুরু করে। কিন্তু কিছুদিন যেতেই শিউলির ৩টি মুরগিকে মৃত এবং বেশ কয়েকটি মুরগিকে ঝিমুতে দেখা যায়।

ক. রোগ বলতে কী বোঝ?
খ. মুরগিকে টিকা দেওয়া হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. মুরগি পালনে আবিদার সফলতার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. শিউলির ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণপূর্বক তোমার মতামত দাও।

২. মমিন মিয়া তার বাড়ির দক্ষিণ পাশের উঁচু ও পূর্ব পাশের নিচু দুই ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মাটিতে পেঁপে চাষের সিদ্ধান্ত নেন। এ লক্ষ্যে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময়ে জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, চারা রোপণসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথাযথভাবে সম্পন্ন করেন। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি লক্ষ করেন যে, দক্ষিণ পাশের পেঁপে গাছগুলোর স্বাভাবিক অবস্থা থাকলেও পূর্ব পাশের ক্ষেতের কিছু কিছু চারা ঢলে পড়েছে ও পাতা হলদে ভাব হয়েছে।

ক. বস্তুগত উপকরণ ব্যয় বলতে কী বোঝ?
খ. অতিবৃষ্টি রজনীগন্ধা চাষে ঝুঁকি বাড়ায় কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. মমিন মিয়ার বাড়ির দক্ষিণ পাশের পেঁপে গাছগুলো স্বাভাবিক হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. বাড়ির পূর্ব পাশের গাছগুলোর উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বনায়ন

বনায়ন হলো বনভূমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাছ লাগানো, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ করা। সঠিকভাবে বনায়ন করা সম্ভব হলে, সর্বাধিক বনজ দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এসব বনজ দ্রব্য হলো কাঠ, জ্বালানি, বনৌষধি, ফল, মধু, মোম প্রভৃতি। বনায়নের জন্য আমাদের বিভিন্ন প্রকার বনজ বৃক্ষ, ফলদ বৃক্ষ, নির্মাণ সামগ্রী ও ঔষধি উদ্ভিদ সম্পর্কে ভালোভাবে জানা দরকার। এ অধ্যায়ে আমরা এসব উদ্ভিদের পরিচিতি, চাষ পদ্ধতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করব। কৃষিজ নির্মাণ সামগ্রী কাঠ ও বাঁশের গুরুত্ব বলতে পারব। কাণ্ড থেকে নতুন চারা তৈরি করতে পারব। প্রাত্যহিক জীবনে ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবহার বলতে পারব। এ সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করতে পারব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ফলদ, বনজ, নির্মাণ সামগ্রী ও ঔষধি বৃক্ষের চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- কাণ্ড থেকে নতুন চারা তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে বনজ দ্রব্যের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ–১ : ফলদ বৃক্ষ কাঁঠালের পরিচিতি, গুরুত্ব ও চাষ পদ্ধতি

পরিচিতি: কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। এটি খুবই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। অন্য সব ফলের চেয়ে কাঁঠাল আকারে বড়।

কাঁঠাল গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Artocarpus heterophyllus*।

কাঁঠাল একটি দ্বি–বীজপত্রী, কাষ্ঠল ও চিরহরিৎ বৃক্ষ। কাঁঠাল গাছের উচ্চতা ২১ মিটার পর্যন্ত হয়। কাঠ শক্ত ও হলদে রঙের হয়। বীজ সাদা ও ফুল সবুজ রঙের হয়। পাতা সরল, ডিম্বাকৃতি এবং সবুজ। বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে বা কলম পদ্ধতিতে চারা তৈরি করে রোপণ করা হয়ে থাকে। শ্রাবণ–ভাদ্র মাস কাঁঠালের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

চিত্র - ৬.১ : কাঁঠাল গাছ

বাংলাদেশের সব জেলাতেই কাঁঠালের চাষ হয়। গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের ভাওয়াল এলাকায় কাঁঠালের বাগান করা হয়। সিলেট, চট্টগ্রাম ও রংপুর এলাকায় কাঁঠাল চাষ করা হয়। কাঁঠাল লাল মাটির উঁচু জমিতে ভালো জন্মে। এ উদ্ভিদের কাঠ ও ফলের প্রচুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশে কাঁঠালের অনুমোদিত জাত কম। কেবল বারি উদ্ভাবিত কয়েকটি জাত ও লাইন রয়েছে। কাঁঠাল সাধারণত বছরে একবার ফল দেয়। কোয়ার গুণের ভিত্তিতে কাঁঠালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১। খাজা কাঁঠাল – এসব কাঁঠালের কোয়া শক্ত।

২। আধারসা কাঁঠাল – এসব কাঁঠালের কোয়া মুখের দিকে শক্ত কিন্তু পিছনের দিকে নরম।

৩। গলা কাঁঠাল – এসব কাঁঠালের কোয়া নরম। মুখে দিলেই গলে যায়।

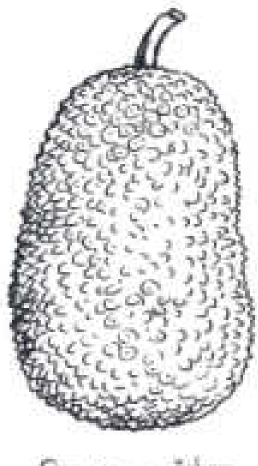

চিত্র-৬.২ : কাঁঠাল

গুরুত্ব : কাঁঠাল একটি বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী উদ্ভিদ। পাকা কাঁঠালের রসাল কোয়া খুবই মিষ্টি। শর্করা ও ভিটামিনের অভাব মেটাতে পাকা কাঁঠালের জুড়ি মেলা ভার। কাঁচা কাঁঠাল এবং কাঁঠাল বীজ সবজি হিসেবে ব্যবহার হয়। কাঁঠাল কাঠ খুবই উন্নত মানের। এর রং গাঢ় হলুদ। এ কাঠ খুবই টেকসই এবং ভালো পলিশ নেয়।

বাসগৃহের জানালা ও দরজা তৈরিতে এ কাঠ ব্যবহৃত হয়। ঘরের সব রকম আসবাবপত্র তৈরিতে কাঁঠাল কাঠ ব্যবহার করা যায়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কাঁঠাল কাঠ এবং পুষ্টির জন্য এর ফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাঁঠাল পাতা দুর্যোগকালীন সময়ে গরু–ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়।

চাষ পদ্ধতি

জমি নির্বাচন ও জমি তৈরি: বন্যামুক্ত সব ধরনের মাটিতে কাঁঠালের চাষ হয়। তবে পলি–দোআঁশ বা অম্ল লালমাটির উঁচু জমিতে কাঁঠাল চাষ খুব ভালো হয়। কাঁঠালের জমি কয়েকবার লাঙল ও মই দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করতে হয়। চারা রোপণের একমাস আগে ১০ মিটার দূরে দূরে ১মিটার × ১মিটার × ১ মিটার আকারে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্ত তৈরির সময় উপরের ও নিচের মাটি আলাদা রাখতে হবে। এবার গর্তে জমাকৃত উপরের মাটি নিচে দিয়ে নিচের মাটির সাথে সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। সারের পরিমাণ হবে – পচা গোবর ২০ কেজি, হাড়ের গুঁড়া ৪০০ গ্রাম অথবা টিএসপি ১৫০ গ্রাম, ছাই ২ কেজি অথবা এমওপি ১৫০ গ্রাম।

চারা রোপণ ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা: বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে বা কলম পদ্ধতিতে চারা করে রোপণ করা হয়। চারা রোপণের জন্য শ্রাবণ–ভাদ্র মাস উপযুক্ত সময়। চারা রোপণের পর গোড়ার মাটি কিছুটা উঁচু করে দিতে হয়। খরা মৌসুমে প্রয়োজনে পানি সেচ দিতে হবে। মাঝে মাঝে গোড়ার মাটি খুঁচিয়ে আলগা করে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ: কাঁঠাল গাছে প্রতি বছর সার প্রয়োগ করতে হবে। ২–৫ বছর বয়সের গাছে গোবর সার ৩০ কেজি, ইউরিয়া ২০০ গ্রাম, টিএসপি ১৫০ গ্রাম এবং এমওপি ১০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। ফলবতী গাছে পচা গোবর ৫০ কেজি, ইউরিয়া ৮০০ গ্রাম, টিএসপি ৫০০ গ্রাম এবং এমওপি ৮০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হবে।

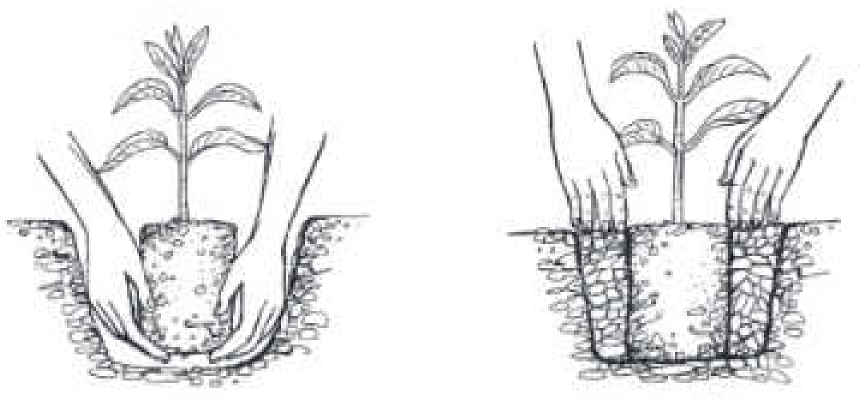

চারা বসানো হচ্ছে চারার চারপাশে মাটি চেপে দেওয়া হচ্ছে

চিত্র-৬.৩ : চারা রোপণ

ফল সংগ্রহ: কাঁঠাল গাছে জাতভেদে ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে ফুল আসে এবং ফল ধরার তিন মাসের মধ্যে কাঁঠাল পুষ্ট হয়। ফল পরিপক্ব হলে গায়ের কাঁটাগুলো ভোঁতা হয়ে যায় এবং বোঁটার কষ পাতলা হয়। তাছাড়া টোকা দিলে টন টন শব্দ হয়।

কাজ : কাঁঠাল গাছ পর্যবেক্ষণ (দলগত কাজ)।
কাঁঠাল চারা, পাতাসহ নমুনা ডাল, ফুল, ফল ও বীজ পর্যবেক্ষণ কর। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যসমূহ পোস্টার কাগজে লেখ। এবার দলগতভাবে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : চিরহরিৎ বৃক্ষ, সরল পাতা

পাঠ–২ : বনজ বৃক্ষ মেহগনির পরিচিতি, গুরুত্ব ও চাষ পদ্ধতি

পরিচিতি : মেহগনির আদি নিবাস জামাইকা ও মধ্য আমেরিকা। মেহগনি গাছের প্রজাতি হিসেবে ২টি নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে বাংলাদেশে *Swietenia macrophylla* প্রজাতি প্রধান। যশোর, খুলনা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে মেহগনি গাছ বেশি পাওয়া যায়। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বনায়ন সৃষ্টিতে প্রায় সারা দেশে ব্যাপক হারে এ গাছ লাগানো হচ্ছে। সড়ক, বাঁধ, বসতবাড়ি, প্রাতিষ্ঠানিক প্রাঙ্গণ, সামাজিক বন ও ব্যক্তিগত বনবাগানে এ গাছের চাষাবাদ বাড়ছে।

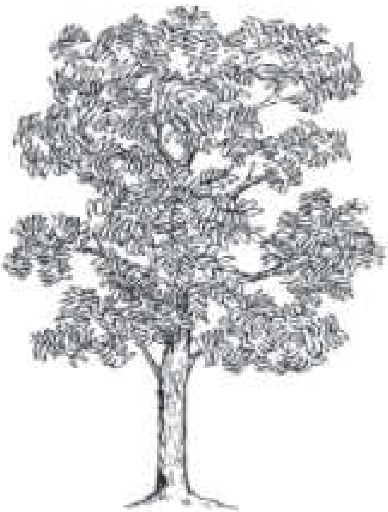

চিত্র-৬.৪ : : মেহগনি গাছ

এটি একটি দ্বিবীজপত্রী কাষ্ঠল উদ্ভিদ। এ উদ্ভিদের কাণ্ড লম্বা, শক্ত ও বাদামি রঙের। পাতা যৌগিক। ফুল সবুজাভ–সাদা। ফল বাদামি রঙের, ডিম্বাকৃতি এবং আকারে বেশ বড়। শীতকালে এ বৃক্ষের সব পাতা ঝরে যায়। এ জন্য একে পত্রঝরা উদ্ভিদ বলে। মেহগনি গাছের জন্য প্রধানত বীজ থেকে উৎপাদিত চারা রোপণ করতে হয়। মার্চ–এপ্রিল মাসে বীজ সংগ্রহ করে নার্সারির বীজতলায় বুনতে হয়। জুন থেকে শুরু করে আগস্ট মাস পর্যন্ত মেহগনি চারা রোপণ করা হয়। উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে মেহগনি গাছ ভালো জন্মে। মেহগনি উন্নতমানের কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ হিসেবে পরিচিত। বাসগৃহের দরজা জানালা,

আসবাবপত্র তৈরিতে মেহগনি কাঠের খুব কদর রয়েছে। মেহগনি কাঠের আঁশ খুব মিহি এবং কালচে খয়েরি রঙের। এ কাঠ খুব ভালো পলিশ নেয়।

গুরুত্ব : মেহগনি কাঠ খুবই শক্ত ও টেকসই। এ কাঠের রং লালচে খয়েরি। তবে গাছ বেশি পরিপক্ব হলে, কাঠের রং অনেক সময় গাঢ় কালচে খয়েরি রঙের দেখায়। এ কাঠের আঁশ খুবই মিহি। এ কাঠ খুব সুন্দর পলিশ নেয়। বাসগৃহের সব রকম আসবাবপত্র তৈরিতে এ কাঠের বহুল ব্যবহার রয়েছে। তাছাড়া ঘরের দরজা, জানালার ফ্রেম তৈরিতেও মেহগনি কাঠ উত্তম। মেহগনি কাঠ দিয়ে হরেক রকমের সৌখিন শিল্প সামগ্রীও তৈরি হয়।

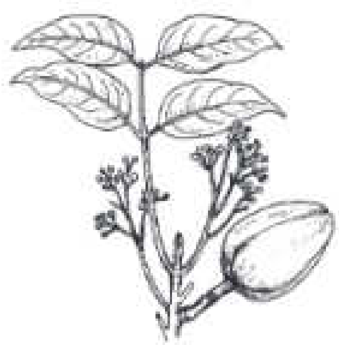

চিত্র-৬.৫ : মেহগনির পাতা, ফুল ও ফল

চাষ পদ্ধতি

বীজ সংগ্রহ ও রোপণ: মেহগনি গাছের জন্য প্রধানত বীজ থেকে উৎপাদিত চারা রোপণ করা হয়। তবে স্টাম্প বা মোথাও রোপণ করা যায়। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত বীজ সংগ্রহ করে নার্সারির বীজতলায় বা পলিব্যাগে বুনতে হয়। দুই ভাগ দোআঁশ মাটি ও একভাগ জৈব সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে পলিব্যাগে বীজ বপন করতে হবে। প্রতি পলিব্যাগে দুটি বীজ বপন করতে হয়। বেডের সারিতে ৮–১০ সেমি দূরে দূরে বীজ বপন করতে হয়। মাটির ৩–৪ সেমি গভীরে বীজ ঢুকিয়ে দিতে হয়। বীজ একটু কাত করে লাগাতে হবে যেন বীজের পাখা উপরের দিকে থাকে। বীজ বপনের পর হালকা সেচ দিতে হবে। ছোট অবস্থায় চারায় দুপুর রোদের সময় ছায়ার জন্য ঢাকনা দিতে হবে। এই চারা শ্রাবণ–ভাদ্র মাসে বা পরের বছর রোপণ করা হয়। বীজের অঙ্কুরোদগমে ২০–৩০ দিন লাগে। চারার রোপণ দূরত্ব ৯–১০ মিটার হলে ভালো হয়।

মাটি তৈরি: উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে মেহগনি গাছ ভালো জন্মে। দোআঁশ ও পলি–দোআঁশ মাটি মেহগনি গাছের জন্য উত্তম। চারা রোপণের পূর্বে নির্বাচিত জায়গা আবর্জনামুক্ত ও সমান করে নিতে হবে। চারার আকার অনুসারে গর্তের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা ৬০–৮০ সেমি হওয়া দরকার। গর্ত করার পর গর্তের মাটিতে সার মেশাতে হবে। সার মেশানো মাটি দিয়ে ভরাটকৃত গর্ত ১৫ দিন ফেলে রাখতে হবে। অতঃপর মাটি পুনরায় কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে চারা রোপণ করতে হবে।

সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচর্যা

মাটি তৈরির সময় সার প্রয়োগের নিয়মাবলি: মাটি তৈরির সময় জৈব সার ১০–১৫ কেজি, ছাই ১–২ কেজি, ইউরিয়া ২০০–৩০০ গ্রাম, টিএসপি ১০০–৫০০ গ্রাম ও এমওপি ৫০–১০০ গ্রাম দিতে হয়। খরার

সময় পানি সেচ দিতে হবে। নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। চারা অবস্থায় মূল গাছের পার্শ্বকুঁড়ি অপসারণ করতে হবে। চারায় খুঁটি ও বেড়া দিতে হবে। সেচের পর গাছের গোড়ায় মালচিং বা জাবড়া দিতে হবে। গাছ বড় হওয়ার পর ডাল ছাঁটাই করে কাঠামো তৈরি করতে হবে।

কাজ– ১: মেহগনি চারা, পাতাসহ ডাল, ফল ও বীজ পর্যবেক্ষণ কর। দলগত আলোচনার মাধ্যমে নিচের ছকটি পূরণ কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

পর্যবেক্ষণের বিষয়	মেহগনি গাছের বৈশিষ্ট্য
১. কী ধরনের উদ্ভিদ	
২. কাণ্ড	
৩. বীজ	
৪. ফুল	
৫. কোথায় কোথায় চাষ হয়	
৬. কেমন মাটিতে চাষ হয়	
৭. প্রধান প্রধান গুরুত্ব	

কাজ– ২: মেহগনি চারা রোপণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার সারের নমুনা পর্যবেক্ষণ করে শনাক্ত কর।

নতুন শব্দ : পত্রঝরা উদ্ভিদ, যৌগিক পাতা, মালচিং

পাঠ–৩ : নির্মাণ সামগ্রী উদ্ভিদ বাঁশের পরিচিতি, গুরুত্ব ও চাষ পদ্ধতি

পরিচিতি : গৃহ নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে বাঁশ পরিচিত। গরিবের কুটির থেকে বড় বড় অট্টালিকা তৈরিতেও বাঁশের ব্যবহার অপরিহার্য। আমাদের দেশের সর্বত্রই বাঁশ চাষ হয়। বাঁশ সাধারণত মোথা বা রাইজোম থেকে চাষ করা হয়। বীজ থেকেও বাঁশের চাষ হয়ে থাকে। বাঁশ সাধারণত ৫ থেকে ৭ মিটার লম্বা হয়। বাঁশ খুবই শক্ত। কাঁচা বাঁশ সবুজ হয়। পরিপক্ব বাঁশ হালকা ঘিয়ে রঙের হয়। বাঁশের চিকন চিকন ডালকে কঞ্চি বলা হয়। বাঁশের পাতা চিকন ও লম্বাটে আকৃতির। বাঁশ গাছে একশত বছরে একবার ফুল ও বীজ হয়। প্রাকৃতিকভাবেও বাঁশ বাগান তৈরি হয়।

চিত্র-৬.৬ : বাঁশঝাড়

বাংলাদেশে প্রায় ২৩ রকমের বাঁশ দেখা যায়। এলাকা ভিত্তিক বাঁশ প্রধানত দুই প্রকার।

১. বন জঙ্গালের বাঁশ : যেমন– মুলি, মিতিঙ্গা, ডলু, নলি তল্লা, বেতুয়া, মাকলা, এসব বাঁশের দেয়াল পাতলা।

২. গ্রামীণ বাঁশ : যেমন– উরা, বরাক, বড়ুয়া, মরাল এসব বাঁশের দেয়াল পুরু।

গুরুত্ব : বাঁশকে গরিবের কাঠ বলা হয়। গ্রামীণ অর্থনীতিতে বাঁশ বিরাট ভূমিকা রাখে। গৃহ নির্মাণ থেকে শুরু করে গ্রামীণ জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য প্রায় সকল ক্ষেত্রে বাঁশের ব্যবহার রয়েছে। বাঁশ গ্রামীণ কুটির শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি, কুলা, ঝাঁপি, মাথাল প্রভৃতি তৈরি হয়। খাল পারাপারে বাঁশের সাঁকো ব্যবহার করা হয়। বাঁশের বাঁশি গ্রামের শিশু–কিশোরদের বাদ্যযন্ত্র। কৃষি উপকরণ যেমন লাঙ্গল, জোয়াল, আঁচড়া ও কোদাল তৈরিতে বাঁশের ব্যবহার হয়। শস্য ও উদ্ভিদ সংরক্ষণে বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়। কাগজ ও রেয়ন তৈরির কাঁচামাল হিসেবে শিল্প কারখানায় বাঁশ ব্যবহৃত হয়।

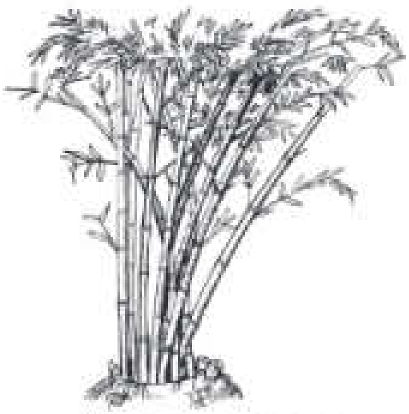

চিত্র–৬.৭ : বরাক বাঁশ

চাষ পদ্ধতি : বাঁশ আমাদের দেশের অতি প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী। বাংলাদেশের সর্বত্রই বাঁশের চাষ হয়। বাঁশ ৩টি উপায়ে চাষ করা হয়। যথা–মোথা ও অফসেট পদ্ধতি, প্রাককঞ্চি কলম পদ্ধতি, গিট কলম পদ্ধতি।

১. মোথা বা অফসেট পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ: বাঁশ চাষের জন্য ১–৩ বছর বয়সী মোথা বা অফসেট সংগ্রহ করতে হয়। বাঁশের গোড়ার দিকে ৩–৪টি গিটসহ মাটির নিচের মোথাকে অফসেট বলে। অফসেটের জন্য নির্বাচিত বাঁশ অবশ্যই সতেজ হতে হবে। চৈত্র মাস অফসেট সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। বর্ষা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংগৃহীত অফসেট অস্থায়ী নার্সারিতে বালির বেডে লাগানো আবশ্যক। ১৫–২৫ দিনের মধ্যে অধিকাংশ অফসেট থেকে নতুন পাতা ও কুঁড়ি গজায়। এ অফসেট আষাঢ় মাসে তিনভাগ মাটি ও একভাগ গোবর দিয়ে তৈরি গর্তে লাগাতে হয়।

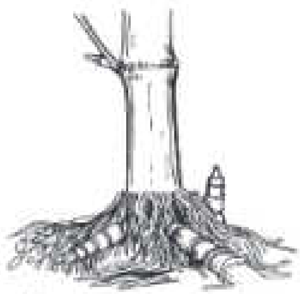

চিত্র–৬.৮ : বাঁশের মোথা

২. প্রাকমূল কঞ্চি কলম পদ্ধতি: বাঁশের অনেক কঞ্চির গোড়ায় প্রাকৃতিকভাবেই শিকড় গজায়। এ ধরনের শিকড় ও মোথাসহ কঞ্চিকে প্রাকমূল কঞ্চি বলে।

চিত্র–৬.৯ : বাঁশের কাণ্ডস্থ প্রাকমূল কঞ্চি

ফাল্গুন হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত সময়ে এক বছরের কম বয়সী বাঁশ থেকে করাত দিয়ে সাবধানে শিকড় ও মোথাসহ কঞ্চি কলম কেটে নিতে হবে। সংগৃহীত কলম দেড় হাত লম্বা করে কেটে বালি দিয়ে প্রস্তুত অস্থায়ী বেডে ৭-১০ সেমি গভীরে খাড়া করে বসাতে হবে। নিয়মিত দিনে ২-৩ বার পানি দিলে এক মাস পরে সতেজ চারা তৈরি হবে। পলিব্যাগে ৩:১ অনুপাতে মাটি ও গোবরের মিশ্রণে চারাগুলো স্থানান্তর করতে হবে। এভাবে এক বছর রাখার পর কঞ্চি কলম বৈশাখ - জৈষ্ঠ্য মাসে মাঠে লাগাতে হবে।

৩. গিঁঠ কলম পদ্ধতি: বাঁশের কাণ্ডকে টুকরা টুকরা করে চারা তৈরির পদ্ধতিকে গিঁঠ কলম পদ্ধতি বলে। ১-৩ বছরের সবল বাঁশ নির্বাচন করতে হবে। সদ্য কাটা বাঁশকে ৩ গিঁঠ সহ লম্বা লম্বা খণ্ডে ভাগ করতে হবে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বিভক্ত খণ্ডগুলো সাথে সাথে অস্থায়ী বেডে সমান্তরাল ভাবে বসিয়ে দিতে হবে। নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে।

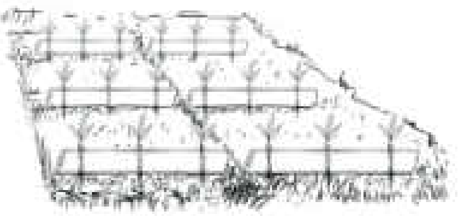

চিত্র- ৬.১০ : অস্থায়ী বেডে গিঁঠ কলম

বাঁশের টুকরার গিঠের কুড়ি সতেজ ও অক্ষত আছে কিনা তা লক্ষ রাখতে হবে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের দিকে অধিকাংশ গিঁঠ কলমে শিকড় গজাবে। বর্ষা শেষ হওয়ার আগেই শিকড়সহ গিঁঠ কলম বেড থেকে উঠিয়ে নিয়ে মাঠে লাগাতে হবে।

বাঁশের পরিচর্যা: নতুন বাঁশঝাড়ে খরার সময় পানি সেচ দিতে হবে। মোথার গোড়ার মাটি কুপিয়ে আলগা করতে হবে। আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ মোথাসহ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বাঁশের ঝাড়ে নতুন মাটি দিলে সুস্থ সবল নতুন বাঁশ পাওয়া যাবে।

বাঁশ সংগ্রহ : বাঁশ পরিপক্ব হতে ৩ বছর সময় লাগে। এ জন্য ঝাড় থেকে ৩ বছর বয়সী বাঁশ সংগ্রহ করতে হবে। বাঁশ গজানোর মৌসুমে কখনো বাঁশ কাটা উচিত নয়। একবারে ঝাড়ের সব পরিপক্ব বাঁশ কাটাও উচিত নয়।

কাজ : তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে মোথা পদ্ধতি, প্রাকমূলকঞ্চি কলম পদ্ধতি ও গিঁঠ কলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ নিয়ে আলোচনা কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর (সময় ১৫ মিনিট)।

নতুন শব্দ : অফসেট পদ্ধতি, গিঁঠকলম পদ্ধতি, প্রাকমূলকঞ্চি পদ্ধতি

পাঠ–৪: ঔষধি বৃক্ষ নিম গাছের পরিচিতি, গুরুত্ব ও চাষ পদ্ধতি

পরিচিতি : মানুষ রোগ নিরাময়ের জন্য অনেক সময় উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। এসব উদ্ভিদকে কী বলা হয়? তোমার চেনা কয়েকটি ঔষধি উদ্ভিদের নাম বল। অর্জুন, হরিতকী, আমলকী, প্রভৃতি ঔষধি বৃক্ষের নমুনা বা চিত্র পর্যবেক্ষণ কর। এবার তুলসী, থানকুনি, বাসক, গাঁদা প্রভৃতি ঔষধি লতাগুল্মের নমুনা বা চার্টের চিত্র বা ভিডিও চিত্র পর্যবেক্ষণ কর। তোমাদের বাড়িতে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব ঔষধি বৃক্ষ ও লতাগুল্ম রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে দলে আলাপ কর।

চিত্র-৬.১১ : নিম গাছ

চিত্র-৬.১২ : পাহাড়ি নিম পাতা

বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই নিম গাছ দেখা যায়। নিমের কমপক্ষে ২টি প্রজাতি রয়েছে। এগুলো হলো *Melia azedarach* (ঘোড়া নিম) এবং *Azadirachta indica*। নিম মাঝারি থেকে বড় আকারের পত্রঝরা বৃক্ষ। ১০ থেকে ২০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে নতুন পাতা গজায়। পাতা যৌগিক, ৯-১৫টি পত্রফলক থাকে। পত্রফলকগুলো লম্বাটে, তির্যক ও বর্শাকৃতির হয়। পত্রফলকের কিনারা খাঁজকাটা। ফুল সাদা সুগন্ধিযুক্ত। ফল ডিম্বাকৃতির। ফল পাকলে হালকা হলদে হয়।

বংশবিস্তার : বীজ দ্বারা বংশবিস্তার করা হয়। মূল ও কান্ডের কাটিংয়ের মাধ্যমেও বংশবিস্তার করা যায়।
বীজ সংগ্রহের সময় : জুন-জুলাই মাসে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

গুরুত্ব : নিম গাছের ব্যবহার অনেকভাবে হয়ে থাকে। তবে এর ঔষধিগুণ মানুষের যথেষ্ট উপকার করে থাকে। নিমপাতার নির্যাস শস্যের কীটনাশক হিসেবে ভালো কাজ করে। চর্মরোগে নিম পাতার রস ও নিমের তেল ব্যবহারে উপকার হয়। নিম পাতার রস কৃমির উপদ্রব কমায়। নিমের শুকনা পাতা কাপড়ের ও চালের পোকা দমনে ব্যবহার হয়। নিমের ডাল ভালো দাঁতের মাজন হিসেবে ব্যবহার হয়। নিমের খৈল জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। নিম গাছের বাকল বাতজ্বর, দাদ, বিখাউজ, একজিমা, দাঁতে রক্ত ও পূঁজ পড়া, পায়রিয়া, জন্ডিস রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। বাকলের রস দাঁতের মাড়ি শক্ত করে।

চাষ পদ্ধতি

জমি প্রস্তুত ঃ আমাদের দেশের মাটি ও জলবায়ু নিম চাষের জন্য খুবই উপযোগী। সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটিতে নিম চাষ ভালো হয়। জমি প্রথমে ভালোভাবে পরিষ্কার ও আগাছামুক্ত করে চাষ দিতে হবে।

চারা উৎপাদন ঃ জুন-জুলাই মাস নিমের বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। পাকা ফল থেকে খোসা ছাড়িয়ে বীজ আলগা করে পরিস্কার পানিতে ধুয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। বীজ সংগ্রহের এক সপ্তাহের মধ্যেই চারা উৎপাদনের জন্য পলিব্যাগে বপন করতে হয়। উৎপাদিত চারা এক বছর পর মে-জুন মাসে মূল জমিতে রোপণ করতে হয়।

গর্ত তৈরি ও চারা রোপণ ঃ নিমের চারা রোপণের জন্য ৭ মিটার × ৭ মিটার দূরত্বে ১ মিটার × ১মিটার × ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটি একদিকে ও নিচের মাটি আরেক দিকে রাখতে হবে। তারপর গর্ত ও গর্তের মাটি ১৫ দিন রোদে শুকাতে হবে। গর্তের নিচের মাটির সাথে পচা গোবর বা আবর্জনা পচা সার মিশিয়ে এবং উপরের মাটি নিচে দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। এর ১৫ দিন পর এক বছর বয়সের চারা গর্তের মাঝখানে রোপণ করতে হবে। চারার গোড়ায় মাটি একটু উঁচু করে দিয়ে পানি সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা ঃ চারার গোড়ায় খুঁটি ও বেড়া দিতে হবে। খরা মৌসুমে প্রয়োজনে পানি সেচ দিতে হবে। মাঝে মাঝে গোড়ার মাটি খুঁচিয়ে আলগা করে দিতে হবে। জমিতে আগাছার উপদ্রব দেখা দিলে নিড়ানি দিতে হবে। নিম গাছে সাধারণত রোগ ও পোকার আক্রমণ কম দেখা যায়।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন ঃ নিম গাছের পাতা, ফুল, ফল, বীজ ও তেল বিভিন্ন ঔষধে ব্যবহার করা হয়। গাছ রোপণের ৮—১০ বছরের মধ্যে তা থেকে পাতা, ছাল, ফল ও বীজ সংগ্রহ করা যায়।

কাজ : নিম চারা রোপণ করা [দলীয় কাজ]।
তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে দলগতভাবে নিমের চারা রোপণ কর।

নতুন শব্দ : পাতার নির্যাস, জীবাণুনাশক

পাঠ–৫ : বৃক্ষ ও বন সংরক্ষণ

বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ ও বন সংরক্ষণ

আমাদের বনজ সম্পদের পরিমাণ শতকরা ১৭ ভাগ। আবার নানা কারণে বিরাজমান বনজ সম্পদও ধ্বংসের মুখোমুখি। এই বনজ সম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধি করতে হলে বনায়ন দরকার। আমাদের চারপাশের নতুন রোপণ করা চারা ও বন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

চারায় পানিসেচ দেওয়া

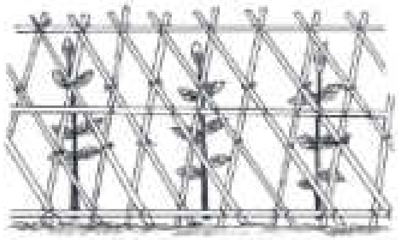

চারায় বেড়া দেওয়া

কাঁঠাল বৃক্ষ (প্রুনিং এর পূর্বে)

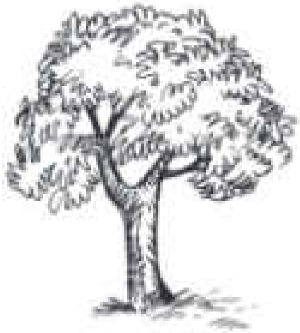

কাঁঠাল বৃক্ষ (প্রুনিং এর পরে)

চিত্র-৬.১৩ : বৃক্ষের চারা ও বৃক্ষ সংরক্ষণ

কাজ : রোপণ করা চারা ও বৃক্ষ সংরক্ষণ

১. উপরের চিত্র পর্যবেক্ষণ কর। রোপণ করা চারা সংরক্ষণের উপায়গুলো লেখ।
২. প্রুনিং এর মাধ্যমে কাঁঠাল বৃক্ষ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখ।

কাঁঠাল বৃক্ষকে মূল্যবান করে তোলার জন্য অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কর্তন করাকে প্রুনিং বলা হয়। গাছকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রুনিং করা হলে কাঠের পরিমাণ ও মান উন্নত হয়। সড়ক বাঁধ, বসতভিটা সবক্ষেত্রেই উপযুক্ত পরিচর্যা না করলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয় না। চারা ছত্রাকজনিত রোগ বা পোকা-মাকড় দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ আক্রান্ত হলে রাসায়নিক কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক দিয়ে তা দমন করতে হবে। তবে প্রাকৃতিকভাবে রোগবালাই দমন করতে পারলে খুবই ভালো হয়।

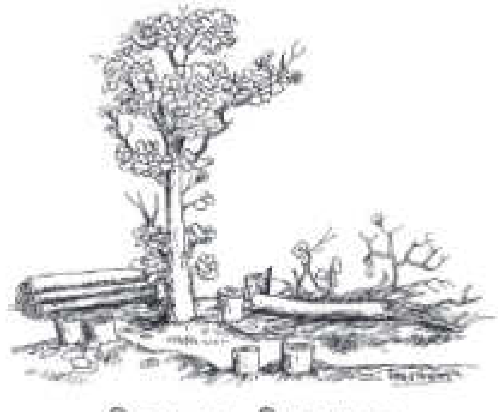

চিত্র-৬.১৪ : বিপন্ন শালবন

বন সংরক্ষণ

আনুর বন ভ্রমণের গল্প

গাছপালায় ঘেরা মনোরম পরিবেশ আনুর খুবই পছন্দ। শীতের ছুটিতে সে বাবার সাথে গাজীপুরের শালবন ভ্রমণে গেল। বনের শাল ও গর্জন গাছ দেখে সে আনন্দিত হলো। কিন্তু বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বনের গাছ কেটে উজাড় করার দৃশ্য তাকে খুবই কষ্ট দিল। সে দেখলো বন দখল করে মানুষ বসতবাড়ি নির্মাণ করছে। এ ছাড়া নানা উপায়ে বন ধ্বংস করে দখলের পালা চলছে। তার বাবা বললেন আরও বিস্তৃত এলাকাজুড়ে এ বন ছিল। বনে হরেক রকমের পশুপাখি দেখা যেতো। বাবার কাছে আরও জানল বনদস্যুরা এ বনের বৃক্ষ কেটে চুরি করে বিক্রি করছে। আনু আমাদের দেশের বন রক্ষা করার উপায় নিয়ে সারারাত ভাবল। তার খাতায় সে বন রক্ষার উপায় সম্পর্কে লিখলো।

উপায়গুলো নিচে উল্লেখ করা হলো –

১. বনদস্যুদের প্রতিহত করতে হবে।
২. জনগণকে বনের গুরুত্ব বোঝাতে হবে।
৩. সামাজিক বন সৃষ্টিতে সবাইকে অংশ নিতে হবে।
৪. বনের পশু–পাখি ধ্বংস করা যাবে না।
৫. স্বাভাবিক নিয়মে বন সৃষ্টিতে বাধা দেওয়া যাবে না।
৬. বন সংরক্ষণ আইন জানব এবং সবাইকে তা মেনে চলার পরামর্শ দিব।
৭. জনগণকে বন সংরক্ষণে সচেতন করব।

কাজ : তোমরা সবাই আনুর বন ভ্রমণের গল্প মন দিয়ে শোন। দলগতভাবে বন সংরক্ষণে আরও কী কী উপায় অবলম্বন করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা কর। পোস্টার পেপারে চিত্রটি সম্পন্ন করে দলগত উপস্থাপন কর।

পাঠ–৬ : কাণ্ড থেকে নতুন চারা তৈরি পদ্ধতি

উদ্ভিদের কাণ্ড থেকে নতুন চারা তৈরির পদ্ধতি এক ধরনের কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন পদ্ধতি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে জানতে পেরেছি। এ পাঠে আমরা আরও কয়েকটি কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানব।

কাজ : কান্ড খণ্ড থেকে নতুন চারা উৎপাদন (জোড়ায় কাজ)।
চিত্রে শাখা কলম, গুটি কলম ও জোড়া কলম পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ কর। কোনটি কোন প্রকারের কৃত্রিম অঙ্গজ পদ্ধতি তা শনাক্ত কর।

১. **শাখা কলম বা কাটিং** : যখন উদ্ভিদের শাখা থেকে কর্তন বা ছেদ কলম তৈরি করা হয় তখন তাকে শাখা কলম বা কাটিং বলে। এ পদ্ধতিতে একটি বৃক্ষের শাখা কেটে ভেজা মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে শাখাটি স্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে নতুন গাছে পরিণত হয়। যেমন- গোলাপ, শিমুল, মান্দার ইত্যাদি।

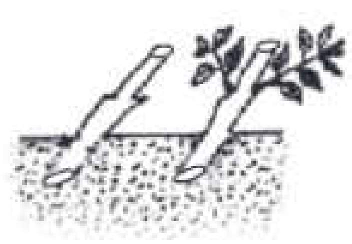

চিত্র- ৬.১৫: শাখা কলম

২. **গুটি কলম** : এ পদ্ধতিতে ভালো জাতের মাতৃগাছ থেকে কলম করে নতুন গাছ তৈরি করা হয়। গুটি কলম খুবই জনপ্রিয় ও সহজ পদ্ধতি। লেবু, পেয়ারা, সফেদা, লিচু, রঙ্গন প্রভৃতি গাছে এ পদ্ধতিতে কলম করা হয়। গুটি কলম তৈরির জন্য এক বছর বয়সের সতেজ ডাল নির্বাচন করতে হবে। এবার তিনভাগ দোআঁশ মাটির সাথে একভাগ পচা গোবর সার মিশিয়ে পানি দিয়ে পেস্ট তৈরি করতে হবে। চিত্রের মতো করে ধারালো ছুরি দিয়ে নির্বাচিত কাণ্ডের অগ্রভাগ থেকে অন্তত ৬০ সেমি নিচের ৫ সেমি অংশের বাকল গোল করে ছাড়িয়ে নিতে হবে। বাকলমুক্ত অংশ প্রথমে ছুরির ভোতা পাশ দিয়ে একটু ঘষে সবুজাভ পিচ্ছিল আবরণ তুলে নিতে হবে। এবার বাকলমুক্ত অংশে চিত্রের মতো করে পেস্ট পলিথিনে মুড়ে দুই মুখ সুতা দিয়ে বাঁধতে হবে। ৩–৪ সপ্তাহের মধ্যে বাকল তোলা অংশে সাদা শিকড় পলিথিনের বাইরে থেকে দেখা যাবে। শিকড় ভালো করে গজালে এবং বাদামি রঙের হলে ডালটিকে কেটে টবে লাগিয়ে কয়েকদিন ছায়ায় রাখতে হবে। মাঝে মাঝে টবের মাটিতে পানি দিতে হবে। রোদে রাখলে কয়েকদিন পর নতুন পাতা গজাবে।

চিত্র- ৬.১৬ : গুটি কলম

৩. বিযুক্ত জোড় কলম

এ কলমের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ ক্লেফ্ট গ্রাফটিং

ক্লেফ্ট গ্রাফটিং

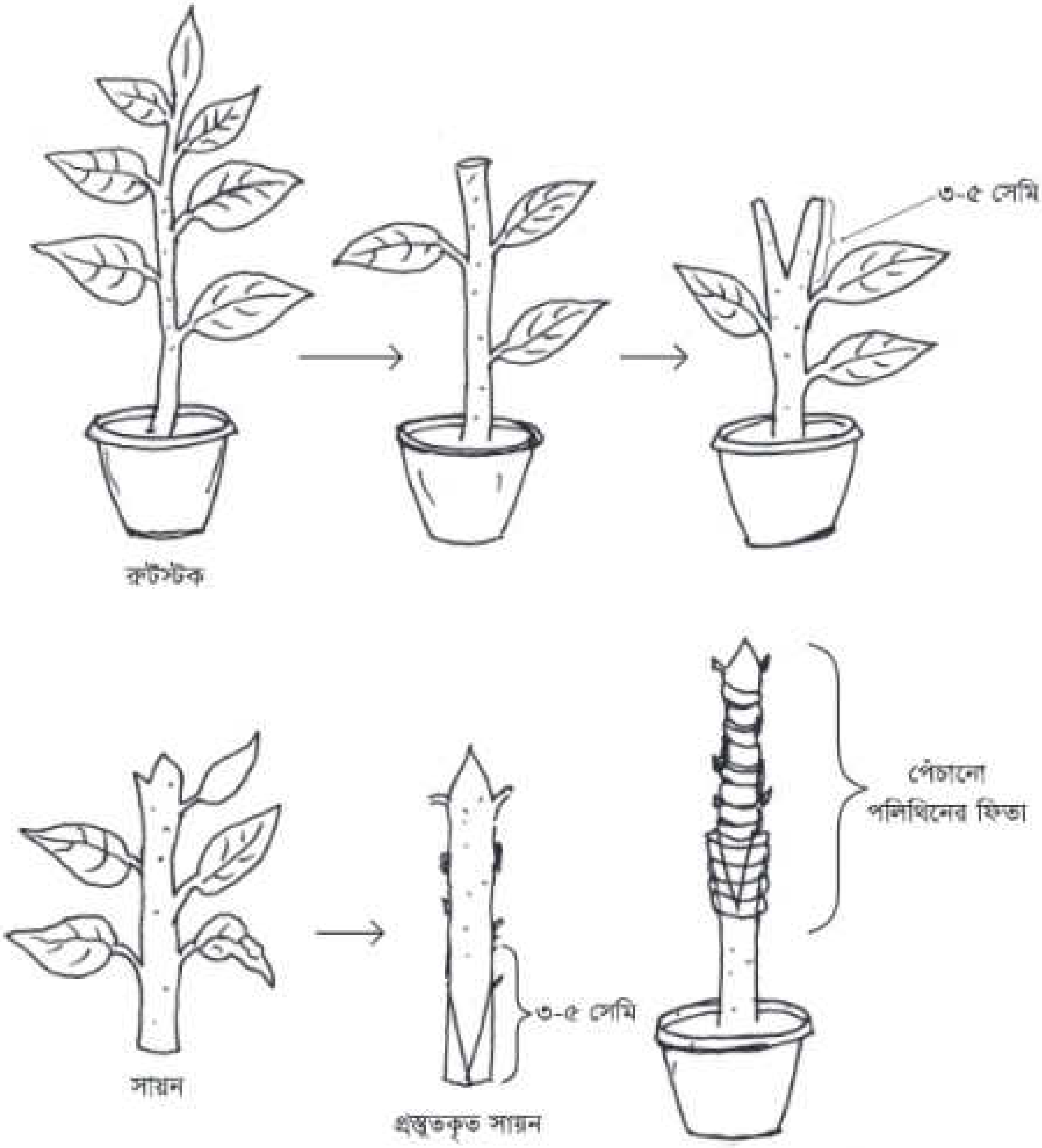

চিত্র : ৬.১৭ আমের ক্লেফ্ট গ্রাফটিং পদ্ধতির ধাপসমূহ

বিযুক্ত জোড় কলম : বিযুক্ত জোড় কলমের মধ্যে ভিনিয়ার গ্রাফটিং ও ক্লেফ্‌ট গ্রাফটিং অন্যতম। তবে বর্তমানে ক্লেফ্‌ট গ্রাফটিং বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ পদ্ধতিটি সহজ এবং সফলতার হার বেশি। আম, কাঁঠাল, কামরাঙ্গা, জলপাই, কদবেল, সফেদা, গোলাপজাম, জাম ইত্যাদির ক্লেফ্‌ট গ্রাফটিং এর মাধ্যমে বংশবিস্তার করা যায়। আমরা আমের ক্লেফ্‌ট গ্রাফটিং পদ্ধতিতে উন্নত জাতের চারা তৈরি সম্পর্কে জানব।

আমরা জানি জোড় কলমে আটির চারা গাছকে রুটস্টক এবং উন্নতজাতের গাছের শাখাকে সায়ন বলে। আমের ক্লেফ্‌ট গ্রাফটিং বছরে দুবার করা যায়। বর্ষার আগে মার্চ থেকে মে মাস এবং বর্ষার পরে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। ৩-১৫ মাস বয়সের রুটস্টক উত্তম। সায়ন হিসেবে এমন শাখা নির্বাচন করতে হবে যার শীর্ষ কুঁড়ি সজীব ও অল্প কিছুদিনের মধ্যে ফুটবে। ১০-১৫ সেমি লম্বা সায়ন যার পাতা গাঢ় সবুজ হয়ে উঠেছে, এমন শাখা নির্বাচন করতে হবে। এবার ধারালো ছুরির সাহায্যে সায়ন থেকে পাতা ছাড়াতে হবে। এবার সায়নের নিচের দিকে তেরছাভাবে 'ভি' আকৃতি করে ৩-৫ সেমি পরিমাণ কাটতে হবে। অতঃপর রুটস্টকের গোড়া থেকে ৪০-৪৫ সেমি উপরে কাণ্ডটি গোল করে কাটতে হবে। কাটা অংশের নিচে যেন ৩-৪ টি পাতা থাকে। এবার ধারাল ছুরির সাহায্যে কাটা অংশের মাঝ বরাবর উপর থেকে নিচের দিকে ৩-৫ সেমি ফাড়তে হবে। ঐ ফাটলে সায়নটি প্রবেশ করিয়ে পলিথিনের ফিতা দিয়ে নিচ থেকে সায়নের প্রায় কুঁড়ি পর্যন্ত শক্ত করে পেঁচিয়ে বেঁধে দিতে হবে। তার সমব্যাসের না হলে সায়নের যেকোনো এক পাশ রুটস্টকের এক পাশের সাথে মিলিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এরপর খেয়াল রাখতে হবে রুটস্টকের কাণ্ড থেকে কোনো শাখা প্রশাখা যেন বের না হয়। বের হলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে। $১\frac{১}{২}$ মাস থেকে ৩ মাসের মধ্যে কলম জোড়া লেগে যায়। ভালোভাবে জোড়া লেগে গেলে পলিথিনের বাঁধন কেটে ছাড়িয়ে নিতে হবে। না কাটলে পলিথিন সায়নের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সায়ন ভেঙে যায়।

কাজ : বিভিন্ন দলে শাখা কলম, গুটি কলম ও জোড় কলম নিয়ে আলোচনা কর। প্রত্যেক দল নির্ধারিত কলমটির চিত্র পোস্টার পেপারে আঁক। এবার উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : শাখা কলম, গুটি কলম, ভিনিয়ার কলম, সায়ন

২০২৪

পাঠ : ৭ কৃষিজ নির্মাণ সামগ্রী কাঠের ব্যবহার

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কাঠের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। গৃহ নির্মাণ ও আসবাবপত্র তৈরিতে কাঠ ব্যবহার করা হয়। তোমাদের বাড়ি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে নিয়ে ভাব। এসব স্থানে কী কী জিনিস তৈরিতে কাঠের ব্যবহার হয়? কোন কোন গাছের কাঠ কী কী কাজে ব্যবহার হয় ?

এসো এবার আমরা কাঠের বিস্তৃত ব্যবহার শিখি।

১. গৃহ নির্মাণ সামগ্রী তৈরি: বাসগৃহের খুঁটি, আড়া, পাটাতন ও বেড়ার চাটাই তৈরিতে কাঠের ব্যবহার হয়। এছাড়া জানালা–দরজার ফ্রেমও কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। শাল, সেগুন, সুন্দরী, কড়ই, দেবদারু প্রভৃতি উদ্ভিদের কাঠ এসব কাজে ব্যবহার হয়।

২. আসবাবপত্র তৈরি: চেয়ার, টেবিল, সোফা, খাট, আলমারি প্রভৃতি কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। মেহগনি, সেগুন, কড়ই, কাঁঠাল, রেইনট্রি প্রভৃতি উদ্ভিদের কাঠ এসব জিনিস তৈরিতে ব্যবহার হয়।

৩. যানবাহন তৈরি: নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার, বাস, ট্রাক তৈরিতে কাঠের ব্যবহার হয়। এছাড়া গরুর গাড়ি, রিকশা, ভ্যান, রেল লাইনের স্লিপার প্রভৃতি কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। শাল, সুন্দরী, জারুল, বাবলা, পিতরাজ, মেহগনি প্রভৃতি উদ্ভিদের কাঠ এসব যানবাহন তৈরিতে ব্যবহার হয়।

৪. যন্ত্রপাতি তৈরি: লাঙ্গল, জোয়াল, আচড়া, ইলেকট্রিক সুইচ বোর্ড তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। নানারকম খেলার সামগ্রীও কাঠ দিয়ে বানানো হয়। পেন্সিল, কাগজ তৈরিতেও কাঠ ব্যবহার করা হয়। তাল, বাবলা, গাব, লটকন ও গেওয়া কাঠ দিয়ে এসব সামগ্রী তৈরি হয়।

৫. জ্বালানি কাঠ: আম, মান্দার, পিতরাজ প্রভৃতি উদ্ভিদের কাঠ বা বর্জ্য অংশ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয়। এছাড়া দেয়াশলাই তৈরি হয় গেওয়া, শিমুল, কদম ও ছাতিম গাছের কাঠ দিয়ে। প্লাইউড তৈরিতে আম, পিতরাজ, কদম কাঠের ব্যবহার হয়। কেরোসিন কাঠ দিয়ে তৈরি হয় প্যাকেজিং বাক্স।

কাজ : কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ ও এর ব্যবহার (দলীয় কাজ)		
কাঠ ব্যবহারের ক্ষেত্র	কোন কোন কাজে কীভাবে কাঠ ব্যবহার হয় তার ২টি উদাহরণ দাও	কাঠ উৎপাদনকারী ২টি উদ্ভিদের নাম লেখ
১. গৃহ নির্মাণ		
২. আসবাবপত্র তৈরি		
৩. যানবাহন তৈরি		
৪. যন্ত্রপাতি তৈরি		
৫. জ্বালানি		

পাঠ : ৮ কৃষিজ নির্মাণ সামগ্রী বাঁশের ব্যবহার

বাঁশ আমাদের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজে লাগে। তোমরা প্রত্যেকে বাঁশের একটি করে ব্যবহার বলো। এবার এসো আমরা বাঁশের ব্যবহার সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জেনে নেই।

১. নির্মাণ কাজে বাঁশ : গ্রামীণ স্বল্প আয়ের মানুষেরা ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য বাঁশের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে বরাক ও এ জাতীয় শক্ত বাঁশ গৃহনির্মাণে বেশি ব্যবহার হয়।

২. আসবাবপত্র তৈরিতে বাঁশ : প্রধানত মুলি, মরাল ও তল্লা বাঁশ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি হয়। বুকশেলফ, সোফা, মোড়া, চেয়ার প্রভৃতি এসব বাঁশ দিয়ে তৈরি করা যায়।

৩. সজ্জিতকরণে বাঁশ : মরাল, তল্লা ও সূক্ষ্ম আঁশসম্পন্ন বাঁশ দিয়ে সজ্জিতকরণ করা হয়। ঘরবাড়ি ও অফিস সজ্জিতকরণে এসব বাঁশের প্রচুর ব্যবহার হয়ে থাকে।

৪. যন্ত্রপাতি তৈরিতে বাঁশ : শক্ত ধরনের বরাক বাঁশ দিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়। লাঙ্গল, জোয়াল, কোদাল, মই, আঁচড়া প্রভৃতি বরাক বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়।

৫. যানবাহন তৈরি ও জ্বালানি হিসেবে বাঁশ : শক্ত ধরনের বরাক বাঁশ যানবাহন তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। রিকশা, নৌকা, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি তৈরিতে বাঁশের ব্যবহার হয়ে থাকে। সব ধরনের বাঁশ, বাঁশপাতা ও অন্যান্য অংশ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

চিত্র– ৬.২০ : বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. বাংলাদেশের সব জেলাতেই .... চাষ হয়।

খ. বাঁশগাছে একশত বছরে একবার .... ও .... হয়।

গ. কাঁঠাল একটি বহুবিধ ব্যবহার .... উদ্ভিদ।

ঘ. আমাদের বনজ সম্পদের পরিমাণ শতকরা .... ভাগ।

ঙ. .... আমাদের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজে লাগে।

মিলকরণ

	বামপাশ	ডানপাশ
১.	পত্রঝরা	তেঁতুল
২.	দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ	বাঁশ
৩.	বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল ঘাস	মেহগনি
৪.	কাঠের রং লাল হলুদ	আম
৫.	চিরহরিৎ উদ্ভিদ	কাঁঠাল

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

ক. বনায়ন কাকে বলে?

খ. ভেষজ উদ্ভিদ কাকে বলে?

গ. কোন জমিতে মেহগনি ভালো জন্মে?

ঘ. বাঁশের বংশবৃদ্ধির পদ্ধতিগুলো কী কী ?

রচনামূলক প্রশ্ন

ক. মেহগনি গাছের চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

খ. কাঁঠাল গাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

গ. বাঁশ গাছের ব্যবহার বর্ণনা কর।

ঘ. গুটি কলম পদ্ধতিটি বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্যাকেজিং বাক্স তৈরিতে কোন কাঠ ব্যবহৃত হয়?

ক. কদম	খ. শিমুল
গ. কেরোসিন	ঘ. ছাতিম

২. নিম গাছের পত্রফলকগুলো–

i. লম্বাটে
ii. ডিম্বাকৃতির
iii. বর্শাকৃতির

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

রহিম ও করিম দুই বন্ধু।তাঁরা দুজন উন্নত ফার্নিচার তৈরির উদ্দেশ্যে একই জাতীয় এবং মিহি আঁশের বনজ গাছের ২টি ভিন্ন ভিন্ন গুঁড়ি ক্রয় করলেন।একই কাঠমিস্ত্রি দিয়ে ফার্নিচার তৈরির পর দেখা গেল করিমের ফার্নিচারে কাঙ্ক্ষিত রং গাঢ় কালচে হলেও রহিমের ফার্নিচারের রং লালচে খয়েরি হয়েছে। এতে রহিমের মন খারাপ হয়ে গেল।

৩. রহিম ও করিমের ক্রয় করা গাছটি ছিল–

ক. সেগুন	খ. কাঁঠাল
গ. মেহগনি	ঘ. আকাশমনি

৪. করিমের ফার্নিচার উন্নত হওয়ার কারণ গাছটির গুঁড়ি–

i. বেশি পরিপক্ক ছিল
ii. মিহি আঁশের ছিল
iii. খুব সুন্দর পলিশ নিয়েছিল।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাজিদ প্রায়ই পেটের অসুখ ও চর্মরোগে ভোগে। গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এলে দাদা সাজিদকে তাঁর বাগানের একটি গাছের পাতা এবং বাকলের রস খাওয়ান ও শরীরে লাগিয়ে দেন। এতে সে সুস্থ হয়ে উঠে। এ ছাড়া দাদা সাজিদকে তাঁর বাড়ির বিশেষ একটি ফলের বাগানও ঘুরিয়ে দেখান। সাজিদকে তাঁর দাদা আকারে সর্বাপেক্ষা বড় ও বিশেষ গুণসম্পন্ন ঐ ফলটি সম্পর্কে ধারণা দেন।

ক. মেহগনি গাছের একটি প্রজাতির নাম লেখ।

খ. বাঁশকে নির্মাণ সামগ্রী বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. সাজিদের দাদার বাগানের ঐ ফলটি বিশেষ গুণসম্পন্ন কেন, কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব কৃষিতে সাজিদের ব্যবহার করা গাছটির উপযোগিতা বিশ্লেষণ কর।

২.

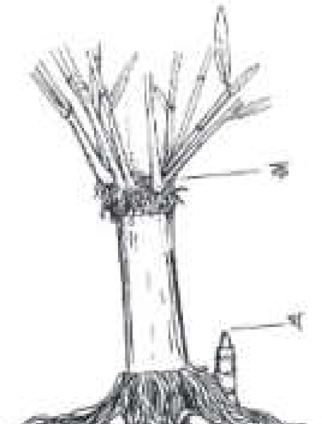

ক. পত্রঝরা উদ্ভিদ কাকে বলে?

খ. কাঁঠাল গাছকে বন্যামুক্ত স্থানে রোপণ করতে হয় কেন ব্যাখ্যা কর।

গ. উপরের চিত্রে প্রদর্শিত ক ও খ এর মধ্যে কোন পদ্ধতিটি কৃত্রিমভাবে বংশবিস্তারে ব্যবহার করা হয় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কৃষিজ সামগ্রী নির্মাণ কাজে চিত্রে প্রদর্শিত উদ্ভিদটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম–কৃষিশিক্ষা

গুরুজনকে মান্য করো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।